ত্রৈমাসিক

আমার স্বাস্থ্য

জেনে চলবো, ভালো থাকবো বুঝে খাবো, সুস্থ থাকবে

২য় বর্ষ ■ ২য় সংখ্যা ■ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ ■ নভেম্বর ২০২০ হ্যাপি হোম এন্ড হেলথকেয়ার এর একটি প্রকাশনা

থাইরয়েডের সংগে বসবাস এবং এর থেকে উত্তরণ

আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভিতরে...

ক্রনিক সাবডুরাল হেমাটোমা

শীতে শিশুর যত্ন নিতে

হার্টের নানান রোগঃ চিকিৎসা ও প্রতিকার

রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সুস্থতা

পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমঃ আর নয় অবহেলা

আমার স্বাস্থ্য অগ্রহায়ণ ১৪২৭ ■ নভেম্বর ২০২০ হ্যাপি হোম এন্ড হেলথকেয়ার প্রকাশনী www.amarshasthobd.com

SUZUKI

Way of Life!

SWIFT
Anniversary Edition

Front Underbody Spoiler

Rear Underbody Spoiler

Side Underbody Spoiler

- 1.2L VVT ENGINE
- DUAL FRONT AIR BAGS
- AUTO GEAR SHIFT TECHNOLOGY
- ABS WITH EBD & BRAKE ASSIST
- REVERSE PARKING SENSORS
- REMOTE KEYLESS ENTRY SYSTEM
- AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
- STEERING MOUNTED AUDIO & CALLING CONTROL
- 15" SILVER ALLOY WHEELS

01711 827082
01708 484772
01704 169342

SUZUKICAR.COM.BD
/ SuzukiCarBangladesh
contactus@suzukicar.com.bd

Sole Distributor
UTTARA MOTORS
(An Enterprise of Uttara Group of Companies)

WE JUTE

www.wejutebd.com

404, Golam Rasul Plaza, 1st Floor (A-4), Dilu Road, New Eskaton, Dhaka.
email: info@wejutebd.com, **01926677541**

সম্পাদকের টেবিল থেকে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শীত আসার বেশ কিছু আগে থেকেই বলে আসছেন, শীতে COVID-19 এর সংক্রমণ বৃদ্ধির বিষয়ে আমাদের সচেতন হবার কথা।

শীতে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে আমাদের সামনে ৩টি করণীয় রয়েছে। (১) স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ (২) প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ (৩) কার্যকর ভ্যাক্সিন প্রয়োগ।

চিকিৎসা ব্যবস্থায় বাংলাদেশ এখন সক্ষমতা অর্জন করেছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, মাস্ক-ই এখন 'সামাজিক ভ্যাক্সিন', সবাইকে শারীরিক দূরত্ব অন্তত:পক্ষে ৩ ফিট বজায় রেখে সামাজিকতা রক্ষা করতে হবে, সাবান পানি কিংবা স্যানিটাইজার দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী হাত ভালো করে পরিস্কার করতে হবে। ভিড় এড়িয়ে চলতে হবে। শিশু ও বয়স্কদের ওপর বিশেষ নজর রাখতে হবে। শীতের এ সময় শীতকালীন রোগ থেকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে করোনা ভাইরাস সে সুযোগটা না নিতে পারে। প্রয়োজন অনুযায়ী মধু, লেবু কিংবা আদার মিশ্রণে গরম চা খেয়ে নাক, মুখ ও শ্বাসনালির অভ্যন্তরীণ আবরন আর্দ্র রাখতে হবে। আর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শীতের শাক সবজি আর মিঠে রোদ গায়ে লাগাতে হবে ভিটামিন ডি এর স্বল্পতা দূর করার জন্য। কারন ভিটামিন ডি একটি অন্যতম মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা অনুপুষ্টি যা মানব দেহে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করে। ভিটামিন ডি রক্তে ক্যালসিয়াম যোগানোর মাধ্যমে এর মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন গবেষণায় প্রমানিত হয়েছে যে, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে মজবুত রাখতে ভিটামিন ডি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে।

সূর্যের আলো ভিটামিন ডি এর একটি প্রধান উৎস। সুর্যালোক দেহের ৮০-৯০% ভিটামিন ডি এর যোগান দেয়। আর চর্বি যুক্ত ও সামুদ্রিক মাছ, ডিম, মাংস মাশরুম ইত্যাদি থেকে আমরা খাবারের মাধ্যমে ভিটামিন ডি পেতে পারি। রৌদ্রের যে দৃশ্যমান আলো আমরা দেখি, তার চেয়ে কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলট্রাভায়োলেট (ইউভি) শরীরের ত্বকের অভ্যন্তরে কোলেস্টরলের (7-dehydrocholesterol) সাথে বিক্রিয়া করে ভিটামিন ডি তৈরি করে।

আমেরিকার সোসাইটি অফ বোন এন্ড মিনারেল রিসার্চ এর গবেষণায় প্রতিয়মান যে, বয়স্ক লোক যারা ভিটামিন ডি স্বল্পতায় ভুগছেন, তাদের মধ্যে এ রোগের আক্রান্তের হার, তীব্রতা এবং মৃত্যুর সংখ্যা বেশী। কাজেই আমরা সবাই চেষ্টা করবো ভিটামিন ডি এর স্বল্পতা দূর করার, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার, আর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ভালো থাকার, সুস্থ থাকার।

সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।
আর ''আমার স্বাস্থ্য'' এর সাথেই থাকুন- এ প্রত্যাশা রইলো।

আইভি খান ওয়াহিদ

আইভি খান ওয়াহিদ

সূচিপত্র

বর্ষঃ ০২, সংখ্যাঃ ০২, অগ্রহায়ণ ১৪২৭, নভেম্বর ২০২০

মূল্যঃ ৫০ টাকা।

থাইরয়েডের সঙ্গে বসবাস এবং এর থেকে উত্তরণ	০৬
থাইরয়েডের ঘরোয়া প্রতিকার	১৫
করোনাকালীন সময়ে প্রবীণ ও দীর্ঘমেয়াদী রোগে আক্রান্ত একা বসবাসকারীদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব	১৮
ক্রনিক সাবডুরাল হেমাটোমা	২০
আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভিতরে...	২৩
হার্টের নানা রোগঃ চিকিৎসা ও প্রতিকার	২৯
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সুস্থতা	৩৫
শীতে শিশুর যত্ন নিতে	৩৮
পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমঃ আর নয় অবহেলা	৪২
শীতে ত্বকের যত্ন নিন ঘরোয়া উপায়ে	৪৫
শীতে হাঁপানি রোগীদের করণীয়	৪৯
হাতে বানানো প্রাকৃতিক নারকেল তেল	৫৪

ত্রৈমাসিক
আমার স্বাস্থ্য
জেনে চলবো, ভালো থাকবো বুঝে খাবো, সুস্থ থাকবো

বাড়ী নং #২১, রোড নং #১২, পুরাতন (৩১)
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯।
ফোনঃ +৮৮ ০১৭১৪ ১৭৮৮৬৩
ইমেইলঃ hhhealth2015@gmail.com

উপদেষ্টা পর্ষদ
অধ্যাপক ডাঃ সায়েবা আক্তার
অধ্যাপক ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর কবির
অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আবদুর রহিম
মেজর (অবঃ) পারভেজ হাসান, পি.এস.সি

সম্পাদক
আইভি খান ওয়াহিদ

নির্বাহী সম্পাদক
ডাঃ শাকিল তানভির

সহ সম্পাদক
ডাঃ শায়লা আজিজ
ডাঃ রোখসানা আফরোজ
ডাঃ আসিফ ইয়াজদানী

গ্রাফিক ডিজাইনার
মুহাম্মদ পাভেল

"আমার স্বাস্থ্য" হ্যাপি হোম এন্ড হেলথকেয়ার প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক ম্যাগাজিন।

কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে জানালে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো।

থাইরয়েডের সংগে বসবাস এবং এর থেকে উত্তরণ

গত ক'টা মাস সকালে ঘুম থেকে উঠলেই ভীষন ক্লান্ত লাগে, মনে হয় আবার ঘুমিয়ে থাকি। ক্লান্তি ভাবটা কাটাতে সময় লাগে। অথচ আমার দশটায় অফিস, বাসার রান্না, ছেলের স্কুল সবইতো সকালেই করতে হয়, হাঁপিয়ে পড়ছিলাম খেয়াল করছিলাম ত্বকের আর্দ্রতা আর চুলের রুক্ষতা ক্রমশই বাড়ছিল, কেমন যেন ভালো লাগছিলো না। মেজাজটাও আস্তে আস্তে খিটমিটে হয়ে যাচ্ছিল, কার্যকারনে দুশ্চিন্তাগ্রস্থতা বাড়ছিল, খেই হারিয়ে ফেলছিলাম দৈনন্দিন কাজের। খাওয়া দাওয়া স্বাভাবিকই ছিল, ডিম খাওয়া বাড়ালাম কিন্তু কাজ হচ্ছিল না। সকালে কফি বা চা খাওয়ার আগ পর্যন্ত কোন কাজই করতে পারছিলাম না। বিষয়টা ক্রমশই দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছিল। আবার তেমন কোন অসুস্থতা নেই, এসিডিটির সামান্য সমস্যা। আর ডাক্তার বলেছিল ফ্যাটি লিভার, তাই দুধ জাতীয় খাবারের প্রতি ছিল নিষেধাজ্ঞা। মেনেই চলছিলাম কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না, ওজনটাও একটু একটু করে বাড়ছিলো। বেশী খারাপ লাগতো সকাল বেলাটা। মনে হতো জোর করে শরীরটাকে টানছি। আমার বড় বোন ডাক্তার তাই ওকে জানালাম ও বলল থাইরয়েডের লেভেল পরীক্ষা করতে। পরীক্ষা করালাম TSH, FT4, FT3 এবং থাইরয়েড এন্টিবডি পরিক্ষার ফলাফল স্বাভাবিক মাত্রা হতে বেশী। অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাবে এর মাত্রা ৪.৫ থেকে ১০ MLU/L (মিলি ইউনিট প্রতিলিটারে) সেটা আমার পাওয়া গেল ২১ MLU/L অর্থাৎ বেশী এর মানে আমার থাইরয়েড গ্রন্থি শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমানে হরমোন তৈরি করতে পারছেনা। এটাকে ডাক্তারী ভাষায় বলা হয় হাইপোথাইরয়ডিজম (hypothyroidism)।

রিপার্ট দেখে ডাক্তার জানালেন আমার আমার সকল উপসর্গ এবং অবসাদগ্রস্থতা আর ক্লান্তির কারন হাইপোথাইরোডিজম এবং তিনি আমাকে থাইরক্স ট্যাবলেট ২৫ মিলিগ্রাম করে সকালে খালি পেটে খাবার পরামর্শ দিলেন। সাথে খাবার গ্রহনে কিছু বিধিনিষেধ, বলেন ভয়ের কিছু নেই তবে এটা

মেনে চলতে হবে এবং নিয়মিত পরীক্ষা করে ঔষধের মাত্রা নির্ধারন করে খেয়ে যেতে হবে। নিয়মিত পরিক্ষা করানোটা কতটা জরুরী তা এখন আমি জানি কারন গত ২ বছর ধরে আমি থাইরক্স খাচ্ছি, কখনো ২৫ মিঃ গ্রাম করে, কখনো ৫০ মিঃ গ্রাম করে এবং কখনো কখনো একদিন বাদ দিয়ে দিয়ে। ঔষধ গ্রহনের এই ভিন্ন মাত্রা একজন চিকিৎসক দ্বারাই নির্ধারন করা হয়। নিয়মিত ২-৩ মাস কোন কোন ক্ষেত্রে ৬ মাস পর পর রক্ত পরিক্ষা করে টি এইচ এস (THS) এর মাত্রা রোগী ভেদে কিংবা THS এর সাথে T3 T4 এর মাত্রার পরিমান দেখে ঔষধের মাত্রা নির্ধারন করতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে শতকরা ৭১% রোগীই নিয়মিত এই পরীক্ষা করান না। ফলশ্রুতিতে একই মাত্রায় ঔষধ সেবন করে যান। দীর্ঘদিন বা একটা সময় পরে ঔষধ খাওয়া বন্ধ করে দেন। এর দু'টোই এই রোগের জন্য ক্ষতিকর। অতিরিক্ত মাত্রায় ঔষধ সেবন হরমোনের মাত্রাকে অনিয়ন্ত্রিত করে তোলে ফলে শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। হঠাৎ করে ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত ঔষধ বাদ করে দিলে টি এইচ এস এর মাত্রা কমে বা বেড়ে যেতে পারে। কোনমতেই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ঔষধ বাদ করা বা মাত্রা বাড়ানো কমানো উচিত নয়। সাথে নিয়মিত পরীক্ষা করানো প্রয়োজন। এ তো গেলো ঔষধের কথা আরেকটা গুরুত্বপূর্ন বিষয় হলো নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন এবং শরীরচর্চা যা আমার ব্যস্ত জীবনে মেনে চলা এবং করাটা কতটা সহজ হবে তা ভেবেই খারাপ লাগা শুরু হলো কিন্তু কিছু করার নাই, তাই শুরু করলাম থাইরয়েডের সাথে বসবাস করার প্রস্তুতি। প্রথমে জানার চেষ্ঠা কেন এটা হলো বা আসলে থাইরয়েড কি?

দেশে প্রতি ৮ জন নারীর মধ্যে একজনের থাইরয়েডের সমস্যা রয়েছে সুতরাং দেশে এ রোগে ভুগছেন এমন রোগীর সংখ্যা সহজেই অনুমেয়। তবে মজার ব্যাপার হলো এদের মধ্যে ৭৯ % রোগীই ভালো করে জানেন না থাইরয়েড আসলে কি? এটা হলে কি হয় এবং কিভাবে এটা হতে মুক্তি লাভ করা যায় বা সুস্থ থাকা যায়। এর পেছনে অনেক কারন রয়েছে।

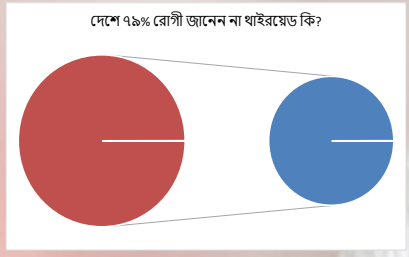

অন্যতম প্রধান কারন হলো তথ্যলাভের সহজলভ্যতা এবং গণসচেতনতা। আমাদের চিকিৎসকের আন্তরিকতার অভাব ও রয়েছে যথেষ্ঠ। একজন রোগীকে সচেতন করার চেয়ে আরেকজন রোগী দেখার বিষয়টিই গুরুত্বপূর্ন। তবে কিছু কিছু হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্রে এ বিষয়ে গণ কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা আছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ক্রমবর্ধমান এই রোগ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা অতীব জরুরী। কারন এর ফলাফলের ভয়াবহতা হেলা করার মত নয়। মানুষের কর্মক্ষতার সাথে এই রোগ ওতপ্রোতভাবে

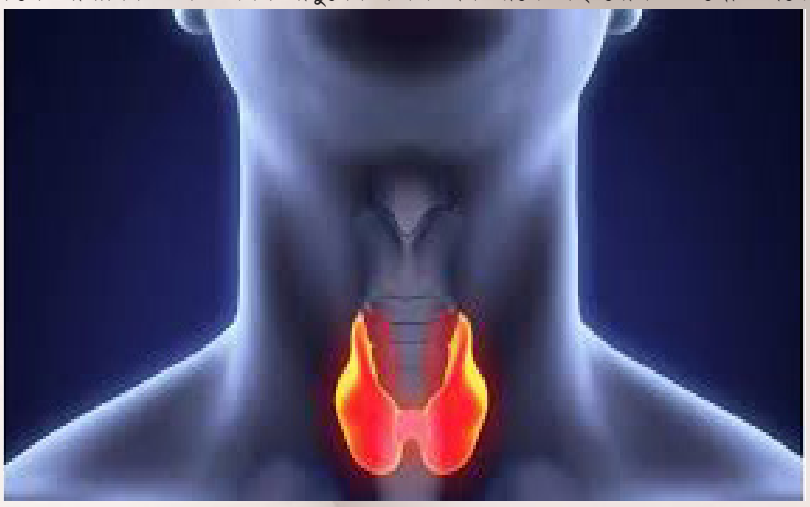

জড়িত। তাছাড়া মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের উপরও এর যথেষ্ঠ প্রভাব রয়েছে। মনে রাখতে হবে দক্ষ এবং কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী যেকোন দেশের জন্য আশীর্বাদ স্বরুপ।

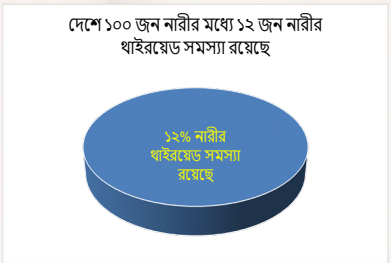

থাইরয়েড কি?

থাইরয়েড আমাদের শরীরের গলার সামনে অবস্থিত একটি গ্রন্থির নাম। এটি থাকে আমাদের গলার স্বরযন্ত্রের দুই পাশে। এই গ্রন্থির কাজ হল আমাদের শরীরের কিছু অত্যাবশ্যকীয় হরমোন উৎপাদন করা যা নিঃসৃত হয়ে আমাদের বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং শরীরের স্বাস্থ্যকর ওজন ও শক্তি বজায় রাখার

ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি কোন কারনে এই গ্রন্থির হরমোন নিঃসরণে কোন প্রকার ব্যতিক্রম হয় তখন এটি বিভিন্ন রোগ ঘটাতে সক্ষম। যা থাইরয়েডের সমস্যাজনিত রোগ হিসাবে পরিচিত। আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রার থেকে অতিরিক্ত পরিমানে হরমোন উৎপাদিত এবং নিঃসৃত হলে যেমন সমস্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও সমস্যা।

থাইরয়েড গ্রন্থি সাধারণত দুই ধরনের হরমোন নিঃসরণ করে।

১. ট্রাই-আয়োডোথাইরোনিন(T3)
২. থাইরক্সিন(T4)

থাইরয়েড জনিত সমস্যাগুলো যা যা হতে পারে

বাচ্চাদের ক্ষেত্রে জন্মের সময় এইগ্রন্থি ঠিকভাবে তৈরি না হলে কিংবা প্রয়োজনমত হরমোন তৈরি করতে না পারলে বাচ্চাদের শারীরিক এবং মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় কেননা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক বিকাশে এটা বিশেষ ভূমিকা রাখে। একজন শিশু যদি ছোট বেলা থেকে এর অভাবে ভোগে তাহলে সে প্রতিবন্ধী হয়ে বড় হবে। যদি তাকে চিকিৎসা দেওয়া না হয়। সে বুদ্ধি ও শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়ে যাবে। এছাড়া আমাদের শরীরে যতটুকু হরমোন প্রয়োজন তার চেয়ে কম কিংবা বেশি পরিমাণে এই হরমোন তৈরি হলে তখন নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। প্রয়োজনের তুলনায় কম পরিমাণে এই হরমোন তৈরি হলে হাইপোথাইরয়ডিজম হতে পারে। আবার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি পরিমাণে এই হরমোন উৎপন্ন হলে হাইপারথাইরয়ডিজম হতে পারে। উভয়ই আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

এছাড়াও উক্ত গ্রন্থিতে আরো বিভিন্ন রকমের রোগ হতে পারে। সাধারণত বেশি হয় এমন কিছু রোগ নিয়ে আলোচনা করা যাকঃ

. হাইপোথাইরয়ডিজম(Hypothyroidism)
. হাইপারথাইরয়ডিজম(Hyperthyroidism)
. গয়েটার(Goiter)
. নডিউল(Nodule)
. থাইরয়েড ক্যান্সার(Thyroid Cancer)
. গ্রেভস ডিজিজ(Graves' disease)

হাইপোথাইরয়ডিজম (Hypothyroidism) ঃ

এই রোগ অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক সময়ে ধরা পড়ে না। থাইরয়েড হরমোনজনিত রোগের লক্ষণগুলো এতটাই বৈচিত্র্যময় হয় যে খুব সহজেই তা চিকিৎসকদের সন্দেহকেও এড়িয়ে যায়। তাই কিছু উপসর্গ আছে যা দেখে আপনি নিজেই সন্দেহ করতে পারবেন হয়তো আপনি হাইপোথাইরয়েডিজম এ ভুগছেন এবং চিকিৎসকের শরনাপন্ন হতে পারবেন। থাইরয়েড গ্রন্থি যদি প্রয়োজনের তুলনায় কম হরমোন উৎপাদন করে তখন হাইপোথাইরয়ডিজম হবার সম্ভাবনা আছে। যদিও অনেক সময় এর চোখে পড়ার মত লক্ষণ দেখা যায়না, যার ফলে অনেকে বুঝতেই পারেন না তারা হাইপোথাইরয়ডিজম এ আক্রান্ত। থাইরয়েডে আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ৬৭% ই হাইপোথাইরয়েডিজমে ভোগে। এই রোগে ভোগা মানুষের মধ্যে ৮৭% এরই উপসর্গ ছিল ক্লান্তি কিংবা অবসাদ অনুভব

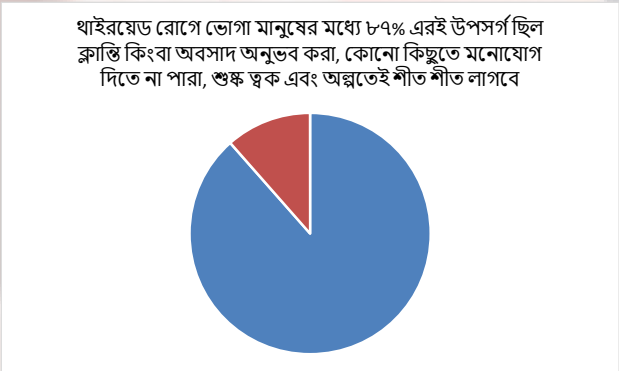

করা, কোনো কিছুতে মনোযোগ দিতে না পারা, শুষ্ক ত্বক এবং অল্পতেই শীত শীত লাগবে। তবে হাইপোথাইরয়ডিজম হলে সাধারণত যে লক্ষণগুলো দেখা যায় তা হলঃ

. ক্লান্তি কিংবা অবসাদ অনুভব করা
. কোনো কিছুতে মনোযোগ দিতে না পারা।
. শুষ্ক ত্বক
. কোষ্ঠকাঠিন্য
. অল্পতেই শীত শীত লাগবে
. পেশী এবং বিভিন্ন জয়েন্টে ব্যথা অনুভূত হবে।
. বিষন্নতা থাকবে
. মহিলাদের ক্ষেত্রে ঋতুস্রাবের সময় অতিরিক্ত পরিমাণ রক্তক্ষরণ হতে পারে।
. পালস রেট কম থাকতে পারে স্বাভাবিক এর তুলনায়।

ইশরাত জাহান
সংবাদ পাঠিকা এবং উপস্থাপিকা
ঢাকা বাংলামিডিয়া এন্ড
কমিউনিকেশন লিঃ (ডিবিসি)

গণমাধ্যমে কাজ করার কারনে খুব যে সব নিয়মমাফিক করতে পারতাম এমনটা নয় বিশেষ করে খাওয়া ও ঘুমানো। হঠাৎ করে শরীরটা খারাপ লাগছিল। বেশ ক্লান্ত আর রুক্ষতা সে ত্বকে এবং মেজাজেও টের পাচ্ছিলাম বদলে যাওয়া। চিকিৎসকের দারস্থ হতে হলো। অনেক গুলো পরীক্ষার নিরীক্ষা করে জানা গেল আমার রক্তে টিএইচএসের মাত্রা বেশী এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে যাকে হাইপোথাইরোডিজম বলে। শুনে প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কারন জানতে ইচ্ছা করলো । চিকিৎসক অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস , ঘুম অর্থ্যাৎ লাইফ স্টাইল , পিসিওএস সহ আরো অনেকগুলো কারন ই বলেন। আমাকে বলেন ঘাবড়াবার কিছু নেই। শুনেছিলাম থাইরয়েড হলে সারাজীবন ঔষধ খেতে হয় ডায়াবেটিকসের রোগীদের মত । তাই একটু খারাপ লাগছিল। কিন্তু আমার চিকিৎসক আমাকে জানালেন এটা সবার ক্ষেত্রে নয় এক্ষেত্রে থাইরয়েড হবার কারন টা জানা জরুরী, অনেক সময় পিসিওএসের জন্যও হতে পারে।

হাইপোথাইরয়েডিজম এবং পিসিওএসের মধ্যে আরও একটি সংযোগ রয়েছে। বায়োমেড রিসার্চ ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্ট অনুসারে, পিসিওএস সাবক্লিনিকাল হাইপোথাইরয়েডিজম গয়টার এবং অটোইমিউনথাইরয়েডাইটিসের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। যাই হোক চিকিৎসক আমাকে নিয়মত্রান্ত্রিক জীবনযাপন করার উপদেশ দিলেন বিশেষ করে ওজন নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন এবং জানালেন না কমলে তখন হয়তো ঔষধ খেতে হতে পারে। তখন আমার ওজন ছিল ৬৭ কেজি অথচ আমার উচ্চতা (৪.১১")অনুযায়ী থাকা উচিত ছিল ৪৭ কেজি। ডাক্তার আমাকে ওজন কমাতে বললেন, এবং জানালেন অতিরিক্ত ওজন কেবল থাইরয়েড নয় শরীরের অনেক ধরনের অসুস্থতা বাড়াতে সাহায্য করে। শুরু হলো আমার নতুন জীবন, একেবারে পাল্টে ফেলবার চেষ্টা নিজেকে। এবং আমি পেরেছি। প্রথমে পাল্টালাম খাদ্যঅভ্যাস, আমি খাবারের তালিকা হতে কার্বোহাইড্রেট মানে ভাত আর চিনি বাদ দিলাম আর যোগ করলাম প্রোটিন এবং ভিটামিন জাতীয় খাবার বিশেষ করে সবজি এবং ফলমূল যা মেটাবোলিজম বাড়াতে সাহায্য করবে। মূলত থাইরয়েড হলে আমাদের শরীরে মেটাবলিজম কমতে থাকে ফলে শরীর ভারী হতে থাকে এবং অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয়। সকালে রুটি ভাজির বদলে দুটো সিদ্ব ডিম আর কাঠ বাদাম খাওয়া শুরু করলাম। ১১-১২ টার দিকে ২টা কলা বা পেয়ারা আর দুপুরে সবজি বা সালাদ মাছ বা মাংস আর রাতে ফলমূল। তবে সপ্তাহে একদিন নিজের পছন্দমত খাবার এবং ভাত খেতে ভুলতাম না।

এটা মোটামুটি কাজকরা শুরু করলো তবে যতটা ওজন কমার কথা ততটা কমলো না কারন থাইরয়েড হলে ওজন কমানো বেশ কঠিন। তাই সাথে ফ্রিহ্যান্ড শরীরচর্চাও শুরু করলাম। এরপর ধীরে ধীরে পাল্টালাম জীবনযাপন প্রনালী। আমি রোজ রাত ৯-১০ টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ি এবং ৪:৩০-৫:০০ মধ্যে ঘুম হতে উঠে যাই।

এছাড়াও থাইরয়েডের জন্য ভিটামিন ডি, সি, বি, জিংক আয়রনযুক্ত খাবার যা কার্যকরী, আমি এর জন্য ট্যাবলেট না খেয়ে সেসব শাক শবজি বা ফলমূলে এই উপাদানগুলো পাওয়া যায় তা খাবার চেষ্ঠা করি, যেমন ভিটামিন ডি এর জন্য, ডিমের কুসুম, সাদা কালো তিসি, বাদাম ইত্যাদি খাই। কিংবা যখন হাতের কাছে যা পাই।

বর্তমানে আমার ওজন ৫৫ কেজি এবং আমার টিএইচএস অর্থ্যাৎ থাইরয়েডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আছে ঔষধ সেবন ছাড়াই।

আমি ৬ মাস পর রক্ত পরীক্ষা করে এর মাত্রা জানার চেষ্টা করি এবং সে অনুযায়ী আমার প্রাত্যাহিক কার্যক্রম এবং জীবনযাপনের প্রনালীতে পরিবর্তন পরিমার্জন করে ভালো আছি। এটি করা খুব সহজ তা নয়, তবে অভ্যাস হয়ে গেলে আর খারাপ লাগেনা। আমার হয়তো ঔষধ লাগেনি নিয়ন্ত্রণ বা নিয়ম মেনে চলাতে। এর মানে সবার যে সেরে যাবে এমনটা নয়, ডাক্তারের পরামর্শ মেনেই আপনাকে যা করার করতে হবে। তবে ঔষধ খেলেও নিয়ম মাফিক খাবার দাবার আর জীবনযাপন প্রক্রিয়াই কেবল থাইরয়েড মোকাবেলা করতে সাহায্য করতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি। মেয়েদের শরীরে এমনিতেই বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন মিনারেলের স্বল্পতা থাকে তাই তাদের জন্য থাইরয়েডকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই এটা সরানোর বা নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রতি সচেতন হতে হবে।

হাইপারথাইরয়ডিজম (Hyperthyroidism)ঃ

এক্ষেত্রে হাইপারথাইরয়ডিজম এর উল্টো ঘটনা ঘটে। থাইরয়েড গ্রন্থি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হরমোন উৎপাদন করলে হাইপারথাইরয়ডিজম হবার সম্ভাবনা থাকে।

থাইরয়েড গ্রন্থিকে নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্রন্থি নামক এক গ্রন্থি। মস্তিষ্কের এই পিটুইটারি গ্রন্থি কে আবার নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস নামক অংশ। এই হাইপোথ্যালামাস থাইরয়েড রিলিজিং হরমোন(TRH) নামক এক হরমোন নির্গত করে। এই TRH হরমোন এর কাজ হল পিটুইটারি গ্রন্থি কে থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন(TSH) নামক এক হরমোন নির্গত করার জন্য সংকেত পাঠানো। এই TSH হরমোন উক্ত গ্রন্থিকে থাইরয়েড হরমোন নির্গত করার জন্য সংকেত পাঠায়। বোঝা গেল তাহলে এই হরমোন উৎপাদন এর জন্য শুধুমাত্র থাইরয়েড গ্রন্থি দায়ী নয়। হাইপোথ্যালামাস, পিটুইটারি গ্রন্থি এবং থাইরয়েড গ্রন্থির মিলিত প্রচেষ্টায় হরমোন নির্গমণ কাজ সম্পন্ন হয়।

এখন উক্ত ৩ টি গ্রন্থির যে কোনো একটি বা একাধিক গ্রন্থি যদি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি কাজ করে ফেলে তখন ফলাফল হিসেবে যতটুকু হরমোন দরকার তার চেয়ে বেশি পরিমাণ হরমোন উৎপন্ন হয়। আর তখনই বাঁধে সমস্যা। যেটা হাইপারথাইরয়ডিজম নামে পরিচিত। এ রোগে ভোগা ৭৮% লোকেরই উপসর্গ ছিল অতিরিক্ত ঘাম এবং গরম সহ্য না করতে পারা সেই সাথে পালস রেট বেড়ে যাওয়া।

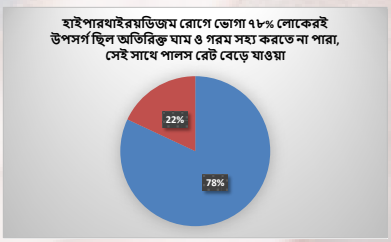

হাইপারথাইরয়ডিজম হলে সাধারণত যে লক্ষণগুলো দেখা যায়ঃ

. অতিরিক্ত ঘাম
. গরম সহ্য না করতে পারা
. হজমে সমস্যা
. দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ বেড়ে যাওয়া।
. অস্থিরতা অনুভব করা।
. ওজন কমে যাওয়া
. পালস রেট বেড়ে যাওয়া
. ঠিকমত ঘুম না হওয়া
. চুল পাতলা এবং ভঙ্গুর হয়ে যাওয়া
. ত্বক পাতলা হয়ে যাওয়া
. মহিলাদের ক্ষেত্রে ঋতুস্রাব অনিয়মত কিংবা খুব অল্প পরিমাণে হওয়া।
. বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে হৃদস্পন্দন বেড়ে যেতে পারে। খুব খারাপ অবস্থা হলে এবং হাইপারথাইরয়ডিজম এর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না নেয়া হলে থাইরয়েড স্টর্ম(thyroid storm) হতে পারে। এতে রোগীর রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে, জ্বর আসতে পারে এবং হৃদস্পন্দন বন্ধও হয়ে যেতে পারে।

গয়েটার (Goitar) ঃ

এছাড়াও থাইরয়েড গ্রন্থিটিই বড় হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে একে গয়েটার(Goiter) বা গলগন্ড বলা হয়ে থাকে। যেহেতু

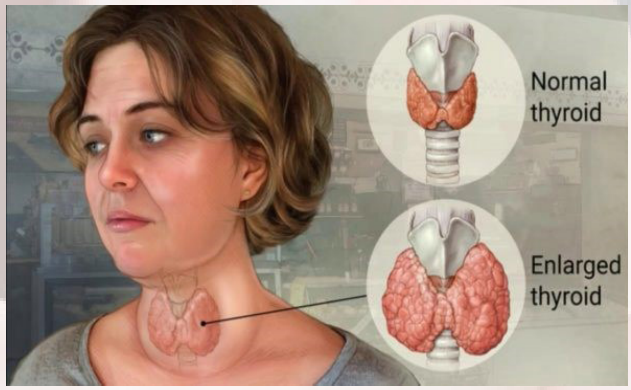

গ্রন্থিটি হরমোন তৈরির জন্য আয়োডিন এর প্রয়োজন পড়ে। সেহেতু আয়োডিনের অভাব হলে গ্রন্থিটি হরমোন তৈরি করতে পারেনা ঠিকভাবে। তবুও এটি চেষ্টা করে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় হরমোন তৈরি করতে। ফলস্বরূপ এটি নিজে বড় হয়ে যায় শরীরের হরমোনের মাত্রা স্বাভাবিক রাখতে। এবং একটা সময় এটি আর পারেনা সেই স্বাভাবিক মাত্রায় হরমোন তৈরি করতে। ফলে হরমোন এর পরিমাণ কমে যায় প্রয়োজনের তুলনায়। এবং ফলাফল হিসেবে উক্ত ব্যক্তি হাইপোথাইরয়ডিজম এ আক্রান্ত হয়। এজন্য যেসব শিশু বা মানুষ আয়োডিন এর স্বল্পতায় ভুগে তাদের এই রোগ হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তবে বর্তমানে লবণের সাথে আয়োডিন গ্রহণের ফলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব অনেকাংশেই কমে এসেছে।

রাজীব পারভেজ
পরিচালক, বেসিক ব্যাংক

আজ থেকে ১১ বছর আগে আমার থাইরয়েড রোগটি ধরা পড়ে। রোগটি যখন ধরা পড়ে তখন ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন নিয়মিত একঘন্টা করে হাটাহাটি করতে হবে এবং আমৃত্যু প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে থাইরক্সিন মেডিসিন সেবন করার জন্য। আমি এই ১১ বছর একদিনের জন্য মেডিসিন সেবন থেকে বিরত থাকিনি। তবে প্রতিনিয়ত হাটাচলা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী করা সম্ভব হয়নি। ডাক্তার বলেছিল থাইরয়েড নিয়ন্ত্রণে না থাকলে পরবর্তীতে ডায়াবেটিস রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অনেকখানি। আমার ডায়াবেটিস ধরা পড়ল কয়েক বছর পরই। এর দুটো কারণ ছিল বলে আমার ধারণা। একটি হলো আমার পিতার ডায়াবেটিস ছিল এবং অন্যটি হলো থাইরয়েড নিয়মিত নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা। থাইরয়েড মেডিসিন সেবনে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে এটি কোন রোগ নয়। আর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে নানাবিধ রোগ হওয়ার আশংকা তৈরি হয়। সুতরাং শুরুতেই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ। বিশেষ করে ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত যাতে আমরা না হই। কারণ থাইরয়েড রোগের পরবর্তী ধাপই হলো ডায়াবেটিস। ব্যক্তিগতভাবে আমার হাইপো থাইরয়েড। এতে অল্প পরিশ্রম করলেই ক্লান্তি চলে আসে এবং নিয়ন্ত্রণ না থাকলে শরীরের ওজন বেড়ে যায়।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করেছি মেয়েদের থাইরয়েড হলে বাচ্চা নেয়ার ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা তৈরি হয়। তবে ছেলেদের থাইরয়েড হলে এই সমস্যা অবশ্য প্রভাব ফেলে না। এ বিষয়ে অনেকের স্পষ্ট ধারণা নেই। তাই এ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে আগানো উচিৎ।

নডিউল(Nodule) ঃ

এছাড়া এইগ্রন্থিতে টিউমার ও হতে পারে। যাকে নডিউল(Nodule) বলে। এক্ষেত্রে এই টিউমার সংখ্যায় এক বা একাধিক হতে পারে। এবং বিভিন্ন আকারের হতে পারে। তবে টিউমার হলেই সবক্ষেত্রে ক্যান্সার হয়না। তবে অবস্থা বেশি খারাপ হলে এবং কোনো চিকিৎসা না নেয়া হলে এটি ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। যাকে বলা হয় থাইরয়েড ক্যান্সার।

Anti-thyroid anti-body: রক্তে antithyroid antibody এর উপস্থিতির অর্থ রোগী Hashimoto's এবং গ্রেভস রোগ এ আক্রান্ত। Hashimoto's এমন এক রোগ যেখানে পুরো থাইরয়েড গ্রন্থিটিই ধীরে ধীরে আক্রান্ত হয়ে যায়।

এছাড়া আরো কিছু পরীক্ষা যেমন নিউক্লিয়ার থাইরয়েড স্ক্যান, থাইরয়েড আল্ট্রাসাউন্ড, কম্পিউটারাইজড এক্সিয়াল টোমোগ্রাফি স্ক্যান (Computerized axial tomography scan) এর মত কিছু পরীক্ষার সাহায্যে ও থাইরয়েড গ্রন্থির বিভিন্ন রোগ সনাক্ত করা যায়।

রোগ সনাক্তকরণঃ

থাইরয়েড এর বিভিন্ন রোগ সনাক্তকরণে সাধারণত নিচের পরীক্ষাগুলো করা হয়ঃ

রক্ত পরীক্ষাঃ

রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে হরমোনের মাত্রা পরীক্ষা করা যায়। রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণত নিচের টেস্টগুলো করতে হয়ঃ

Thyroid Stimulating Hormone(TSH): এই পরীক্ষায় রক্তে TSH এর মাত্রা পরীক্ষা করা হয়। রক্তে TSH এর মাত্রা কম হলে বুঝতে হবে হাইপারথাইরয়ডিজমে রোগী আক্রান্ত। আর বেশি হলে হাইপোথাইরয়ডিজমে আক্রান্ত।

Thyroxine hormone(T4): রক্তে উচ্চমাত্রার T4 এর উপস্থিতির অর্থ হাইপারথাইরয়ডিজম আর নিম্নমাত্রার T4 এর উপস্থিতির অর্থ হাইপোরথাইরয়ডিজম।

Tri-iodothyronine hormone(T3): রক্তে উচ্চমাত্রার T3 এর উপস্থিতির অর্থ হাইপারথাইরয়ডিজম আর নিম্নমাত্রার T3 এর উপস্থিতির অর্থ হাইপোথাইরয়ডিজম।

TSH receptor antibody(TSI): রক্তে TSI এর উপস্থিতির অর্থ রোগী গ্রেভস রোগ এ আক্রান্ত। এই রোগে চোখের চারপাশ ফুলে উঠে।

থাইরয়েডের চিকিৎসা:

রোগের ধরন এবং অবস্থাভেদে আমাদের দেশে সাধারনত বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা বিদ্যমান থাকলেও ট্যাবলেট সেবন এবং সার্জারির প্রচলন বেশী। এই সব রোগীকে প্রতি দিন

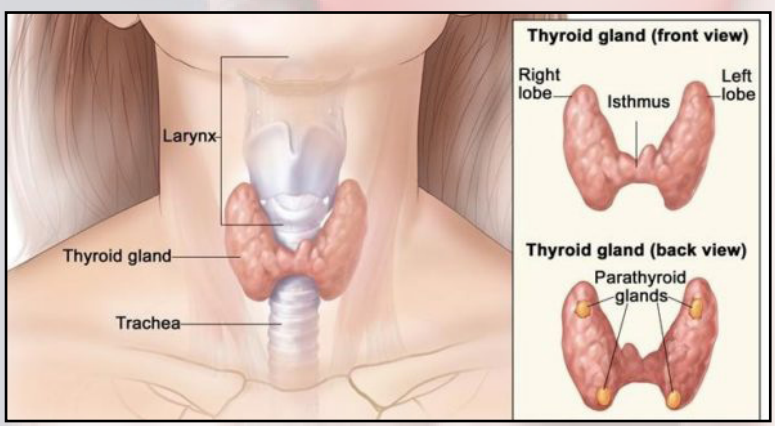

থাইরয়েড হরমোন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে খেতে দেওয়া হয়। টিএসএইচ ও এফটি-ফোর এর মাত্রা রক্তে কেমন আছে সেটির উপর ভিত্তি করে থাইরয়েড হরমোন এর ডোজ নির্ধারণ করা হয়। এই ওষুধ ট্যাবলেট আকারে বাজারে বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়। এই ওষুধটি প্রতিদিন সকালে খালিপেটে খাওয়ার ৩০ মিনিট আগে খেতে বলা হয়। যে সব খাবার খেলে হাইপোথাইরয়েডিজম হতে পারে সেগুলি থেকে বিরত থাকতে বলা হয়। চিকিৎসা শুরু করার ছ'সপ্তাহ থেকে ছ'মাস অন্তর পুনরায় এফটি-ফোর এবং টিএসএইচ মাত্রা দেখা হয় এবং এদের পরিমাণ ঠিক রাখার জন্য থাইরয়েড হরমোনের ডোজ বাড়ানো বা কমানো হয়। নিয়মিত ওষুধ খেলে হাইপোথাইরয়েডিজম রোগ দূরে রাখা সম্ভব। আয়োডিনের অভাবে হাইপোথাইরয়েডিজম হয়ে থাকলে রোগীকে আয়োডিন যুক্ত নুন ও অন্যান্য আয়োডিন পরিপূর্ণ খাবারও খেতে বলা হয়। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকলে কিছু ওষুধ দিয়ে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

হাইপারথাইরয়েডিজমের রোগীকে থাইরয়েড হরমোন কম তৈরি করার জন্য মেথিমাজেল, কার্বিমাজোল ইত্যাদি ওষুধ দেওয়া হয়। কিছু দিন পর রক্তে টি-থ্রি, টি-ফোরের পরিমাণ কমে যায় এবং রোগীর উপসর্গগুলি আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়।

সার্জারি ঃ

হাইপারথাইরয়ডিজম, গয়েটার এবং নডিউল কিংবা টিউমার হলে সেটির ক্ষেত্রে রোগের মাত্রা অনুযায়ী থাইরয়েড গ্রন্থির কিছু অংশ কিংবা পুরোটা কেটে ফেলতে হতে পারে অপারেশানের মাধ্যমে।

তবে ৭০ ভাগ ক্ষেত্রে এই গ্রন্থির অর্ধেক কেটে ফেললেও রোগী তার বাকি অর্ধেক দিয়ে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারে। তবে যাদের পুরো গ্রন্থিটই কেটে ফেলেতে হয় তাদের বাকি জীবন আলাদাভাবে বাহির থেকে প্রয়োজনীয় হরমোন গ্রহণ করতে হয়।

অন্যান্য পদ্ধতি:

বুক ধড়ফড় কম করার জন্য বেটা-ব্লকার ব্যবহার করা হয়। এই সব চিকিৎসায় রোগ নিয়ন্ত্রণে না এলে রেডিও আয়োডিন দিয়ে থাইরয়েড গ্রন্থিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয় অথবা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এই গ্রন্থটিকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন নিউক্লিয়ার মেডিসিন, তেজস্ক্রিয় আয়োডিন ব্যবহার করে আক্রান্ত হবার মাত্রা নির্ধারণ করে চিকিৎসকেরা পরবর্তী পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

সুতরাং কোনো লক্ষণ দেখলে সেটাকে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। আর সুস্থ থাকতে বছরে অন্তত একবার রক্ত পরীক্ষা করে থাইরয়েড গ্রন্থির অবস্থা চেক করতে পারেন।

চিকিৎসা সাবধানতা:

হাইপোথাইরয়েডিজমে চিকিৎসা হলো থাইরয়েড হরমোন। এবং এই চিকিৎসা যেকেউই করতে পারে। একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, একজন এন্ড্রোক্রাইনোলজিস্ট এবং একজন নিউক্লিয়ার মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। এটা সবাই করতে পারে। এখানে নিউক্লিয়ার মেডিসিনের আলাদা করে

কোনো ভূমিকা নেই। তবে যখন হাইপারথাইরয়েডিজমের বিষয়টি আসে, সেখানে নিউক্লিয়ার মেডিসিনের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। হাইপার থাইরয়েডিজম বিভিন্ন রকমের হয়, হাইপার থাইরয়েডিজমের চিকিৎসা হচ্ছে অ্যান্টিথাইরয়েড ওষুধ। যেটি থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতাকে কমিয়ে দেবে। ওষুধের পাশাপাশি সার্জারি করা যেতে পারে। যেহেতু গ্রন্থিটি বেশি কাজ করছে, তাই কিছু অংশ কেটে কার্যকারিতা কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং রেডিও আয়োডিন থেরাপি, আমরা নিউক্লিয়ার মেডিসিনে ব্যবহার করি। এর ভূমিকা খুবই ভালো। যখন অ্যান্টি থাইরয়েড ওষুধ ব্যবহার করা হয়, এটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেড় থেকে দুই বছর ব্যবহার করা হয়। তার পর এই ওষুধ তাকে বন্ধ করে দিতে হবে। রোগী যদি স্বাভাবিক থাকে, খুব ভালো কথা, তবে যদি আবারও হয় এই ওষুধ দিয়ে তাকে চিকিৎসা করার কোনো সুযোগ নেই। রেডিও অ্যাকটিভ আয়োডিন দিয়ে হাইপারথাইরয়েডিজমের ভালো চিকিৎসা হয়।

কিভাবে থাইরয়েড রোগ রক্ত শর্করা প্রভাবিত করে?

থাইরয়েডের রোগটি রক্ত গুকোজ পরিচালনা করতে আরও কঠিন করে তুলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, হাইপারথাইরয়েডিজম সহ, থাইরয়েড হরমোনের প্রচুর পরিমাণে বিপাক বৃদ্ধি পায়। এই ঔষধ, যেমন ইনসুলিন হিসাবে প্রক্রিয়া হতে পারে এবং স্বাভাবিক থেকে শরীর থেকে আরও দ্রুত নির্মূল করতে পারে।

হাইপারথাইরয়েডিজমের সাথে নির্ণয় করা টাইপ ১-এর মতো কিছু লোকের জন্য থাইরয়েড হরমোনের স্থিরত্ব না হওয়া পর্যন্ত ইনসুলিনের উচ্চ মাত্রা গ্রহণ করতে হবে।

বিপরীত হাইপোথাইরয়েডিজম সত্য, যেখানে বিপাক মন্থর হয়। ইনসুলিন শরীরের বেশিরভাগ সময় রক্তে শর্করার উচ্চতর ঝুঁকির কারণ হতে পারে (হাইপোগ্লাইসিমিয়া)।

আপনার ডাক্তারের সাথে আপনার অবস্থা নিয়ে আলোচনা করার আগে পর্যন্ত আপনার থাইরয়েডের রোগের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য আপনি আপনার নির্ধারিত ইনসুলিনের ডোজ নিয়ন্ত্রণ করবেন না।

থাইরয়েড নিঃসৃত হরমোন রক্তে বেশি হলে বা কমলে ইনসুলিনের সংবেদনশীলতা কমে যায়। ফলে ডায়াবেটিস হতে পারে। যেহেতু হাইপোথাইরয়েডিজম বেশি পরিমাণ দেখা যায় হাইপারথাইরেয়ডিজেমের থেকে, সে জন্য সচরাচর আমরা ডায়াবিটিসের সঙ্গে হাইপোথাইরয়েডিজেমের চিকিৎসা করি। এ ছাড়া, গ্রেভস হাইপারথাইরয়েডিজেম এবং টাইপ-১ ডায়াবেটিস যেহেতু একটি অটো ইমিউনি ডিমিক অনেক ক্ষেত্রে এক সঙ্গে দেখা যায়।

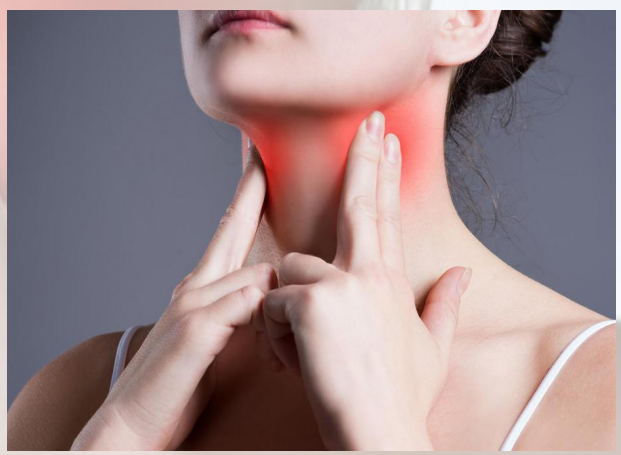

থাইরয়েড ও মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকে?

১. হাইপোথাইরয়েডিজমের লক্ষণের সঙ্গে মানসিক অবসাদের মিল রয়েছে- এর ফলে মানসিক বিষন্নতা, ক্লান্তি, মনঃসংযোগ ব্যাহত হওয়া, সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা, খিদে কমে যাওয়া এবং ওজন বৃদ্ধির মতো সমস্যা হতে দেখা যায়। অন্যদিকে, হাইপারথাইরয়েডিজমের সঙ্গে মানসিক উদ্বেগের লক্ষণগুলোর মিল রয়েছে, যেমন- উচ্চ রক্ত চাপের সমস্যা এবং হৃদস্পন্দনের মাত্রা বেড়ে যাওয়া।

২. থাইরয়েড হরমোনের ভারসাম্যহীনতার ফলে মহিলাদের শরীরে বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটে, যেমন- ওজন বৃদ্ধি, মুখমন্ডলে লোমের পরিমাণের আধিক্য বা চোখের প্রসারণ বা চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসা প্রভৃতি, যা আবার দৈহিক ভাবমূর্তিজনিত সমস্যার সৃষ্টি করে।

যদি কারোর লাগাতার হাইপারথাইরয়েডিজমের সমস্যা থাকে তাহলে নীচের লক্ষণগুলো দেখা দেয়-

. ডিসফোরিয়া (জীবনের সব বিষয়েই অসন্তুষ্টি)
. উদ্বেগ
. খিটখিটে ভাব

. মনঃসংযোগ ব্যাহত হওয়া

যদি কারোর হাইপোথাইরয়েডিজম থাকে তাহলে তার মধ্যে নীচের লক্ষণগুলো দেখা দেয়-

. মানসিক বিষন্নতা
. মস্তিষ্কের ধোঁয়াশা বা মস্তিষ্ক যথাযথভাবে কাজ না করা
. কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে অনীহা
. আলস্য দেখা দেওয়া

বিশেষজ্ঞদের মতে, থাইরয়েড সমস্যার চিকিৎসার পরে যেকোনও মানসিক অসুখের চিকিৎসা হওয়া উচিত বা পর্যায়ক্রমে এই দুটি সমস্যার চিকিৎসাই করা উচিত। তাই, এসব ক্ষেত্রে পরামর্শ হল যে কোনও মানসিক সমস্যার চিকিৎসার প্রস্তুতির আগে থাইরয়েডের বিষয়টা খতিয়ে দেখে নেওয়া জরুরি বা পাশাপাশি এই দুই সমস্যার চিকিৎসাই পর্যায়ক্রমে করা যায়। এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানানো এবং তাদের সাথে এই রোগের মানসিক স্বাস্থ্য সংশিষ্টতা নিয়ে আলোচনা করা উচিত তাতে করে পরিবারের সহযোগিতা পাওয়া সহজ হতে পারে। কেননা মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হলে পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহারঃ

অসুস্থতা বলে কয়ে আসেনা তাই সাবধানতা প্রয়োজন। আর অসুস্থ হয়ে গেলে তা নিয়ন্ত্রণে বা নিবারনে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। থাইরয়েডের অসুস্থতায় সুস্থ থাকতে নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপন করা খুবই জরুরী সাথে প্রয়োজন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যথাযথ মাত্রায় ঔষধ সেবন এবং শরীরচর্চা এবং মানসিক প্রশান্তি।

রেফারেন্সঃ

১. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperthyroidism/symptoms-causes/syc-20373659
২. https://www.endocrineweb.com/conditions/hyperthyroidism/hyperthyroidism-overview-overactive-thyroid
৩. https://www.medscape.com/viewarticle/580420
৪. https://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=radioiodine

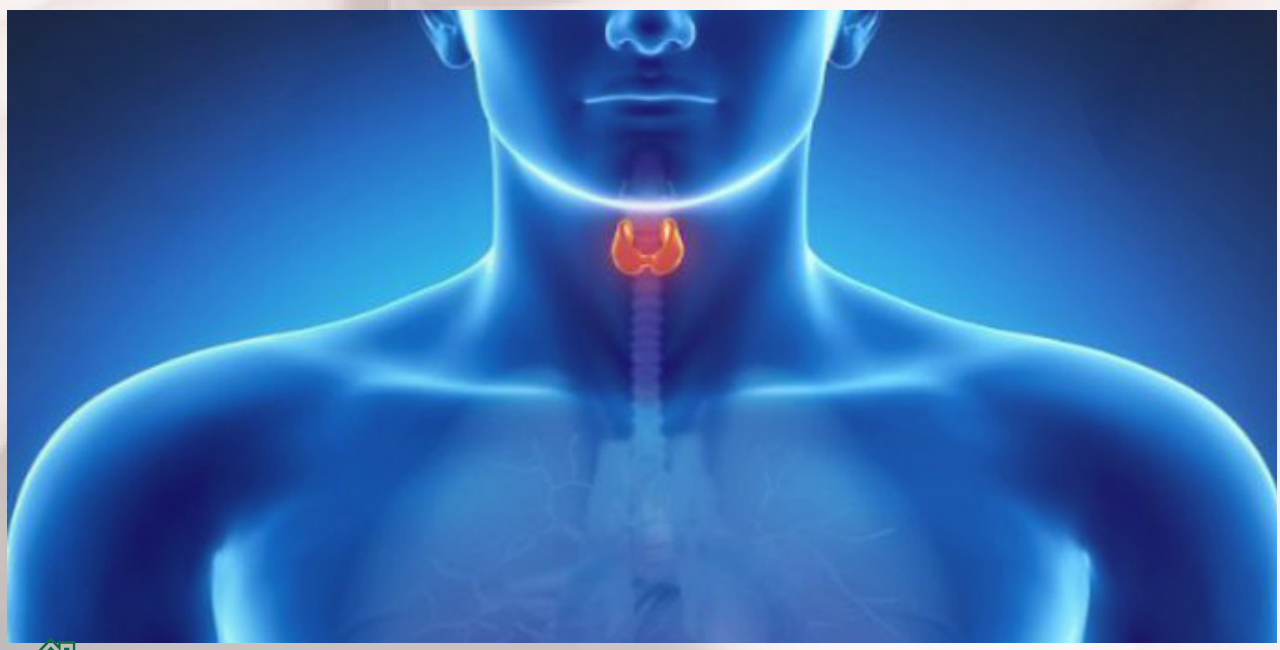

থাইরয়েডের ঘরোয়া প্রতিকার

থাইরয়েড সমস্যায় ভুগছেন। কার্যকরী ঘরোয়া সমাধান খুঁজছেন? তবে থাইরয়েড কি, এর কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে জেনে নিন-

থাইরয়েড রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধে একাধিক চিকিৎসা রয়েছে। তবুও আপনি আপনার নির্ধারিত অসুখের সঙ্গে কিছু ঘরোয়া প্রতিকার নিয়েও দেখতে পারেন। এই প্রতিকারগুলোর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। ফলে এগুলো ব্যবহারও নিরাপদ। ঘরোয়া প্রতিকারগুলোর ব্যবহার থাইরয়েডের রোগের জন্য উপকারী। এগুলো রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

আয়োডিনযুক্ত খাবার

আয়োডিনের ঘাটতি মেটাতে আমরা আয়োডিনযুক্ত লবণ খেয়ে থাকি। কিন্তু অতিরিক্ত লবণ উচ্চ রক্তচাপের কারণ হওয়ায় চিকিৎসকরা লবণ পরিহার করতে বলে থাকেন। তাই লবণের পরিবর্তে সামুদ্রিক মাছ যেমন লইট্টা, কোরাল প্রভৃতি খেতে পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়া চিংড়ি, টুনা মাছেও প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন থাকে। সেদ্ধ ডিম, কলা, দানা জাতীয় শস্য, শাকপাতাতেও প্রচুর আয়োডিন। তাই এসবও খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দেয়া যাবে না।

পালং শাক

থাইরয়েড রোগের প্রতিকারের ঘরোয়া উপায়ের একটি পালং শাক। এই শাক প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ সমৃদ্ধ। যা একজন মানুষের সার্বিক সুস্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। থাইরয়েড সমস্যা নিরাময়ে সাহায্য করে ভিটামিন এ। শরীরের থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে হরমোন ক্ষরণের জন্য ভিটামিন এ ব্যবহার করা হয়। তাই পালং শাক থাইরয়েড সমস্যা প্রতিকারে খুবই কার্যকরী।

কেলপ্

এটা আয়োডিন সমৃদ্ধ আমুদ্রিক শৈবাল। যদিও সংগ্রহ করা খুবই কঠিন। কিন্তু এটা থাইরয়েডের সমস্যা নিরাময়ে খুবই উপকারী। এটি সালাদ বা স্যুপের সঙ্গে মিশিয়ে খাদ্য তালিকায় রাখতে পারেন।

নারকেল তেল

নারকেল তেল খুব সহজলভ্য। থাইরয়েড হরমোনের ক্ষরণ যখন খুব বেড়ে যায় তখন সঙ্গে সঙ্গে ইস্ট্রোজেনের উপাদানও বৃদ্ধি পায়। যা থাইরয়েডের গ্রন্থিক্রিয়াকে বাঁধা দেয়। এই তেল ইস্ট্রোজেনের বৃদ্ধি কমিয়ে আনতে সাহায্য করে আর দেহের বিপাক ক্রিয়া বাড়িয়ে দেয়। ফলে সঞ্চিত মেদ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। থাইরয়েডের সমস্যা প্রতিকারে এক কাপ দুধের সঙ্গে এক টেবিল চামচ নারকেল তেল মিশিয়ে খেতে পারেন।

হলুদ

এটি একটি খুবই জনপ্রিয় মসলা। হলুদে কার্কিউমিন নামক উপাদান রয়েছে। যা থাইরয়েড গ্রন্থির প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। তাই থাইরয়েডের সমস্যা নিরাময়ে হলুদ খুবই উপকারি।

সাধারণ লবণ

আয়োডিন সমৃদ্ধ লবণ থাইরয়েড হরমোন ক্ষরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই রান্না ঘরে ব্যবহৃত লবণ দিয়ে থাইরয়েড সমস্যা প্রতিকার করতে পারেন।

আদা

আদায় রয়েছে জিনজিরাল উপাদান। যা প্রদাহ নিয়ামক হিসেবে পরিচিত। এই জিনজিরাল থাইরয়েড প্রদাহ উপশমেও সাহায্য করে।

ডিমের কুসুম

ডিমের কুসুম কপার সমৃদ্ধ। আর এই কপার থাইরয়েড গ্রন্থিগুলোকে মসৃণ রাখে। তাই থাইরয়েড সমস্যা সমাধান করতে ডিমের কুসুম খাদ্য তালিকায় রাখতে পারেন।

যোগ ব্যায়াম

যোগ ব্যায়ামের কিছু নির্দিষ্ট আসন থাইরয়েড সমস্যা সমাধানে আশ্চর্যজনক ফল দেয়। তবে যোগ ব্যায়ামগুলো যেকোন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সাহায্যে করা উচিত।

আখরোট

এটি একটি সহজলভ্য শুকনো খাবার। প্রায় সবার রান্না ঘরেই এটা থাকে। এটি ম্যাগনেসিয়াম ও আয়রণ সমৃদ্ধ খাবার। যা থাইরয়েডের হরমোন ক্ষরণ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে থাকে। তাই এটিও থাইরয়েড সমস্যা সমাধানে খুবই উপকারি।

উচ্চমানের টাইরোসিন আমিষযুক্ত খাবার

টাইরোসিন দরকার হয় থাইরয়েড হরমোন তৈরিতে।

উচ্চমানের টাইরোসিন প্রোটিন পেতে হলে খেতে হবে মাংস, মুরগির মাংস, ডিম, মাছ, কলা ও মিষ্টি কুমড়ার বিচি।

গরু অথবা মুরগির স্টক

আমরা রান্নাতে বিফ ও চিকেনের যে স্টকটি ব্যবহার করি তাতে প্রচুর পরিমাণে অ্যামাইনো এসিড এল-প্রোলিন ও এল-গাইসিন থাকে যা থাইরয়েড হরমোন তৈরিতে সাহায্য করে। তাছাড়া শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং মাংসপেশীর ব্যথা দূর করে।

ফলমূল ও শাকসবজি

ফলমূল ও শাকসবজিতে থাকে ভিটামিন, মিনারেলস ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা প্রদাহ কমায়। তাছাড়া ফলমূল ও শাকসবজি পুষ্টিকর হওয়ায় আমাদের শরীরের হরমোন ব্যালেন্স করে, মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে, এমনকি হার্টের সুরক্ষায়ও এর গুরুত্ব অপরিসীম।

বিশুদ্ধ পানি

পানি শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে এবং পরিপাক ক্রিয়া সচল রাখে। কোষ্ঠকাঠিন্য, শরীরের দুর্বলভাব দূর করতে এমন কি সুগারের প্রতি আসক্তি কমাতে প্রতি ২ ঘন্টা অন্তর কমপক্ষে একগ্লাস বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে।

থাইরয়েড রোগে যে কাজগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে:

১) থাইরয়েড রোগীদের মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই জরুরী। অতিরিক্ত মানসিক চাপের কারণে এ সমস্যা আরো বেড়ে যেতে পারে।
২) থাইরয়েড রোগীদের জন্য ধূমপান খুবই ক্ষতিকর। সিগারেটের ধোঁয়া থাইরয়েডের কাজগুলোকে ব্যাহত করে।
৩) থাইরয়েড রোগীদের ডাক্তারের পরামর্শ ব্যাতীত কোন ওষুধ গ্রহণ করা বা ছেড়ে দেয়া ঠিক নয়।
৪) খাবার খাওয়ার এক ঘণ্টা আগে থাইরক্সিন ওষুধ গ্রহণ করতে হবে। ফাইবার সমৃদ্ধ কোন খাবারের সঙ্গে এই রোগের ওষুধ খাওয়া ঠিক নয়।

১. গয়ট্রোজেনাস জাতীয় খাবার

গয়ট্রোজেনাস খাবার যেমন বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রুকলি, সয়াসস, চিনাবাদাম, শিম ইত্যাদি অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া যাবে না। খেলে রান্না করে খেতে হবে, কাঁচা খাওয়া যাবে না। থাইরয়েড সমস্যা থাকলে এসব খাবার না খাওয়াই ভালো।

২. কলের পানি

অবিশুদ্ধ কলের পানিতে অনেক সময় ফ্লোরিন ও ক্লোরিন থাকে যা আমাদের শরীরের আয়োডিন পরিশোষণে বাধা দেয়। তাই অবশ্যই পানি ফুটিয়ে খেতে হবে।

৩. কফি

অবসাদ দূর করতে আমরা অনেকেই কফি খেয়ে থাকি। এতে থাকে ক্যাফেইন যা থাইরয়েড হরমোনকে ব্লক

করে। তাই আপনি যদি হাইপোথাইরয়েডিজম এ ভুগে থাকেন তাহলে কফির অভ্যাস ত্যাগ করে ফলের জুস খাওয়ার চেষ্টা করুন।

৪. পাস্তুরিত দুধ ও দুধজাতীয় খাবার

থাইরয়েড সমস্যা থাকলে পাস্তুরিত দুধ খাওয়া উচিত নয়। এমনকি দুধজাতীয় খাবার যেমন পনির, দই ইত্যাদি খাবার এড়িয়ে যেতে হবে।

৫. চিনিযুক্ত খাবার

চিনি ওজন বৃদ্ধির জন্য দায়ী, তাছাড়া মেটাবলিজমের জন্য শরীরে হরমোনের যে সামাঞ্জস্য দরকার তাতে চিনি বাধা সৃষ্টি করে। তাই চিনিযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলতে হবে।

৬. রিফাইন্ড ময়দা

রিফাইন্ড বা মিহি করা ময়দা ও ময়দাজাতীয় খাবার শরীরে হরমোন লেভেলে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং ওজন বাড়ায়।

৭. তাছাড়া হাইপোথাইরয়েডিজম রোগীদের তিসির তেল এবং ফলের মধ্যে পীচ ও স্ট্রবেরি এড়িয়ে যাওয়া উচিত। নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সচেতন হোন।
হাইপোথাইরয়েডিজম সমস্যা থেকে শুরু করে শরীরের সকল সমস্যা বুঝতে চেষ্টা করুন আজই, প্রতিকার ও প্রতিরোধে নিন ব্যবস্থা। দেখবেন সতেজ এবং সুস্থ থাকছেন সব সময়।

করোনাকালীন সময়ে প্রবীণ ও দীর্ঘমেয়াদী রোগে আক্রান্ত একা বসবাসকারীদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ প্রবীণ রয়েছে। ২০০২ সালের বিশ্ব প্রবীণ সম্মেলনে গৃহীত "মাদ্রিদ আর্ন্তজাতিক কর্ম-পরিকল্পনা" অনুযায়ী নিরাপদ বার্ধক্য অর্জন প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস রোগে ইউরোপ ও জাপানে যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের প্রায় ৯০ শতাংশের বয়স ৬০ বৎসরের বেশী, ৫০ শতাংশের বয়স ৮০ বৎসর বা তার বেশী।

বাংলাদেশেও উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক প্রবীণ ব্যাক্তি ইতোমধ্যেই পরলোক গমন করেছেন। বৃদ্ধ বয়সে যেহেতু করোনায় ঝুকিঁ বেশি তাই তাদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। করোনা মহামারীকালীন এই সময়ে কিভাবে আমরা তাদের সেবা করতে পারি সে বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন।

অনাকাংখিত ঝুকিঁ এড়াতে তাদের খোজঁ-খবর নিন।

তাদের সাথে সাক্ষাত করতে গেলে অন্তত ১ মিটার সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন এবং শারীরিক সংস্পর্শ যেমন করমর্দন বা জড়িয়ে ধরা থেকে বিরত থাকুন। যদি বিশেষ প্রয়োজনে তাদের সাহায্য করার জন্য শারীরিক সংস্পর্শের প্রয়োজন হয় তবে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সুরক্ষা সামগ্রী (মাস্ক, গোগলস/চশমা এবং হ্যান্ড গ্লাভস) পরিধান করে তাদের সংস্পর্শে যাবেন এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করবেন।

মুদি পণ্যসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও ঔষধ কিনে দিন।

যদি তাদের ঘরে থাকার প্রয়োজন হয়, নিশ্চিত করুন যে তাদের অন্তত ১ মাসের নিয়মিত ঔষধের যোগান আছে কিনা।

যদি তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে কি করতে হবে পরিকল্পনা করে রাখুন এবং সিদ্ধান্ত নিন কীভাবে তাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিতে হবে।

স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-যাপনে উৎসাহ দিনঃ পুষ্টিকর খাবার গ্রহন, পর্যাপ্ত ঘুম, ধূমপান ও নেশাদ্রব্য পরিহার, শারীরিক ভাবে সক্রিয় থাকা।

সদয় হোন এবং সহমর্মিতা প্রকাশ করুন। তাদের সাথে কথা বলুন এবং তারা কি বলতে চায় শুনুন। মানসিক চাপ সামলাতে তাদের সহায়তা করুন। যখন এই বৈশ্বিক মহামারী শেষ হবে, আপনি আবার তাদের জড়িয়ে ধরতে পারবেন!

আপনার পরিজন কেউ যদি বৃদ্ধাশ্রমে থাকে, তাদের সাথে পারতপক্ষে সাক্ষাত না করে ফোন, ভিডিও কল বা ই-মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ বজায় রাখুন।

কোভিড-১৯ এর লক্ষণসমূহ যেমন জ্বর, কাশি বা শ্বাসকষ্ট শনাক্ত করার জন্য তাদের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষনে রাখুন।

ঘরে কারো কোভিড-১৯ এর লক্ষণ দেখা গেলে তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন এবং বেশি বেশি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করুন।

যদি প্রবীণদের মাঝে কোভিড-১৯ এর লক্ষণ দেখা দেয়, তাহলে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ করুন।

নিয়মিত ঘরের উপরিতলগুলো পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করুন এবং ঘরে যথেষ্ট আলো-বাতাস প্রবেশ করতে দিন।

গ্লাস, খাবার গ্রহনের সরঞ্জাম, তোয়ালে ইত্যাদি বস্তু শেয়ার বা সকলে মিলে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।

সাবান পানি দিয়ে ঘন ঘন হাত পরিষ্কার ও জীবানুমুক্ত করুন।

রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-যাপন করুন। পুষ্টিকর খাবার গ্রহন, পর্যাপ্ত ঘুম, শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকার পাশাপাশি ধূমপান এবং নেশাদ্রব্য থেকে বিরত থাকুন।

আপনার এলাকায় যদি কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পরে যথাসম্ভব ঘরে থাকুন। মসজিদ/ উপাসনালয় বা জনসমাগম হয় এমন জায়গা যাওয়া থেকে বিরত থাকুন।

আপনার পরিবার, বন্ধু ও প্রতিবেশীর সাথে যোগাযোগ রাখুন এবং পরিকল্পনা করুন প্রয়োজন হলে খাবার ও স্বাস্থ্যসেবা কিভাবে নিবেন।

কোভিড-১৯ এর লক্ষনসমূহের সাথে পরিচিত হোন যাতে করে শনাক্ত করতে পারেন।

আপনার যদি ফ্লু বা ঠান্ডা-জ্বরের লক্ষণ দেখা দেয় তবে করোনা হটলাইন নম্বরে বা নিকটস্থ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

সর্বোপরি কাশি, শ্বাসকষ্ট হলেই করোনা ধরে বাসায় চিকিৎসা চালাবেন এমনটা নয়। বৃদ্ধ বয়সে হাঁপানী, যক্ষা, হার্ট ফেইলুর ইত্যাদি কারনেও কাশি, শ্বাসকষ্ট হতে পারে। জ্বরের অন্যান্য কারন অনেক থাকতে পারে। তাই চিকিৎসকের শরনাপন্ন হোন। সচেতন থাকুন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন, নিজে বাঁচুন এবং পরিবার ও সমাজের অন্যান্যদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন।

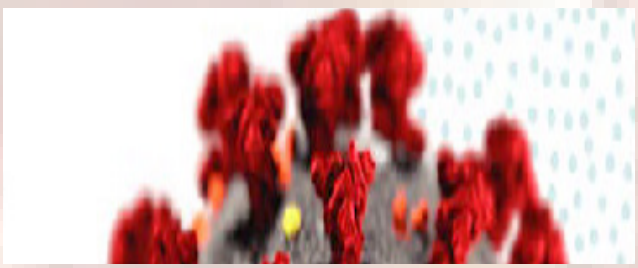

ডাঃ আসিফ ইয়াজদানী
মেডিকেল অফিসার
ডিএনসিসি করোনা আইসোলেশন সেন্টার
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা

ক্রনিক সাবডুরাল হেমাটোমা

একটি গল্প দিয়ে শুরু করা যাক।

বাতেন সাহেব চাকুরি থেকে অবসর নিয়েছেন প্রায় ১ বছর হতে যাচ্ছে। কিন্তু এখনও এই নতুন কর্মহীন জীবনের সাথে ঠিকঠাক মানিয়ে নিতে পারছেন না। এই যেমন গত সপ্তাহের কথাই ধরুন, সকালে ঘুম ভেঙ্গে দেখেন সকাল ৯ টা বাজে।

১০ টায় অফিস। অফিসে দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাড়াহুড়ো করে বিছানা থেকে নামতে গিয়ে পা পিছলে গেল। মাথায় ভালই ব্যথা পেলেন। মাথা ডলতে ডলতে যখন ওয়াশরুমে ঢুকলেন তখন তার মনে পড়লো তিনি এখন অবসরে আছেন। অফিসের বালাই নেই। তার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। সময় কাটানোটা তার জন্য একটা সমস্যা।

এতদিন ভালই ছিলেন। অবসরগ্রহনের পর থেকেই তার নানান সমস্যা শুরু হয়েছে। যদিও আগে থেকেই উচ্চরক্তচাপ ছিল কিন্তু অবসরে যাওয়ার ৩ মাস পর মাইল্ড হার্ট এট্যাক হল। ডাক্তাররা জানালেন তাকে সারাজীবন কিছু অষুধ খেয়ে যেতে হবে। তিনি নিয়মিত তা খাচ্ছেন এবং এখন পর্যন্ত ভালই আছেন। আর গত সপ্তাহে মাথায় ব্যথা পেলেও সেটা খুবই সামান্য ছিল। বাতেন সাহেবের তা মনেও নাই। কিন্তু কিছুদিন যাবত বাতেন সাহেবের আচরণ কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগছে। তিনি খুবই কনফিউসড থাকছেন সবসময়, মাঝে মাঝে বলেন মাথাব্যথা করছে। কথাও কেমন যেন জড়িয়ে যাচ্ছে। আজ বলছেন তার শরীরের ডান পাশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। বাতেন সাহেবের পরিবার খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

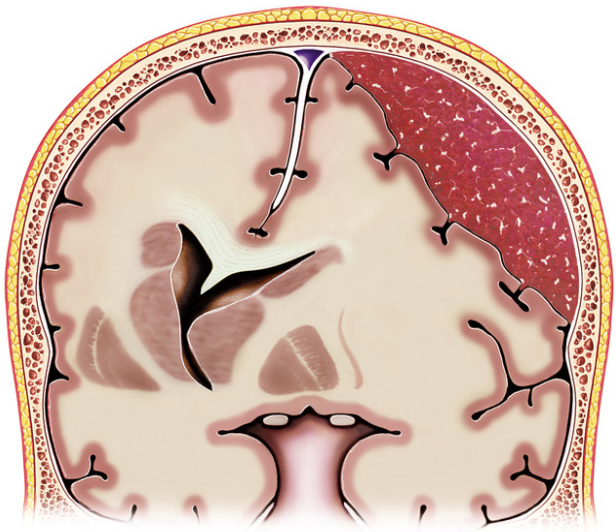

একবার হার্ট এট্যাক হয়েছিল, এখন কি স্ট্রোক হল? তাকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। ডাক্তার সাহেবের পরামর্শে তৎক্ষণাৎ সিটি

স্ক্যান করানো হল। জানা গেল তার ক্রনিক সাবডুরাল হেমাটোমা হয়েছে। ডাক্তার জানালেন, বাতেন সাহেবকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে এবং জরুরি ভিত্তিতে অপারেশন করা লাগবে।

আজ আমরা এই ক্রনিক সাবডুরাল হেমাটোমা নিয়ে একটু জানার চেষ্টা করব।

ক্রনিক সাবডুরাল হেমাটোমা কি ধরনের রোগ? এতে কি হয়?

আমরা জানি, আমাদের মস্তিস্কের একটি আবরণ আছে। একে মেনিনজেস বলে। এই আবরণের ৩টি পর্দা আছে। সবচেয়ে বাইরের পর্দার নাম ডুরা ম্যাটার, মধ্য পর্দার নাম আরাকনয়েড ম্যাটার এবং সবচেয়ে ভেতরের পর্দার নাম পায়া ম্যটার। ক্রনিক সাবডুরাল হেমাটোমাতে ডুরা ম্যাটার এবং আরাকনয়েড ম্যাটার এর মাঝের অংশ

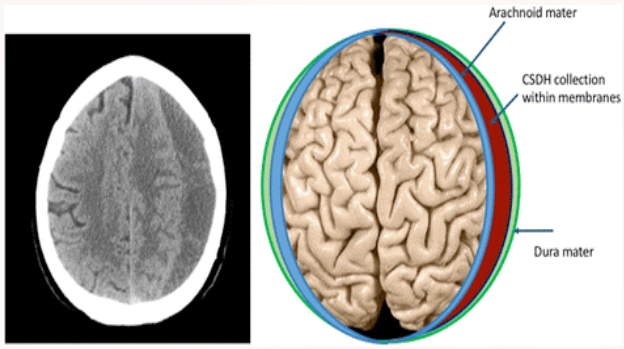

যাকে আমরা সাবডুরাল স্পেস বলি তাতে ধীরে ধীরে রক্তক্ষরণ হয়। এবং এই রক্তক্ষরণ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে এবং রোগীর লক্ষনগুলো প্রকাশ পেতে থাকে।

কাদের ক্রনিক সাবডুরাল হেমাটোমা হতে পারে?

এই রোগটি সাধারনত বয়স্ক মানুষদের হয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞ যারা রক্ত পাতলা করার ওষুধ খাচ্ছেন বা বিভিন্ন রক্তরোগে আক্রান্ত আছেন তাদের ঝুঁকি বেশি। তাছাড়া যারা মদ্যপান করেন তাদের ঝুঁকিও বেশি।

সাধারণত মাথায় আঘাতের কারণে এটি হয়ে থাকে। কিন্তু ৫০% এর বেশি রোগীর ক্ষেত্রে মাথায় আঘাতের ইতিহাস পাওয়া যায়না। কারণ, প্রথমত এটি মাথায় আঘাত ছাড়াও আপনাআপনি হতে পারে এবং দ্বিতীয়ত, মাথায় খুব সামান্য আঘাত পাওয়ার ফলে এই সমস্যাটি হতে পারে এবং রোগীর সেই মাথায় আঘাত পাওয়ার কথা মনেও থাকে না।

ক্রনিক সাবডুরাল হেমাটোমার লক্ষণ কি কি?

১। মাথাব্যাথা,
২। মানসিক অবস্থার পরিবর্তন যেমন, কনফিউশন বা বিভ্রান্তি ভুলে যাওয়া, অবসাদ প্রভৃতি,
৩। কথা বলতে সমস্যা হওয়া যেমন, কথা জড়িয়ে যাওয়া, এলোমেলো কথা বলা,
৪। স্ট্রোক এর মত লক্ষণ দেখা যাওয়া যেমন, দেহের যে কোন একপাশ অবশ হয়ে যাওয়া,
৫। এমনকি জ্ঞান হারিয়ে ফেলা বা খিঁচুনি পর্যন্ত হতে পারে।

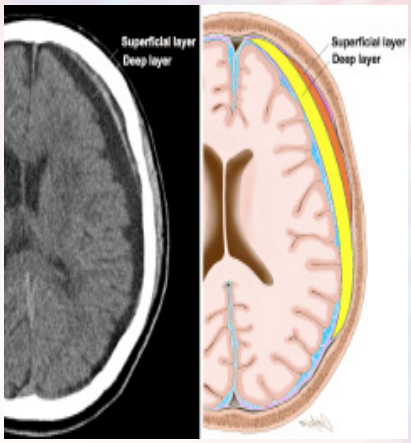

ক্রনিক সাবডুরাল হেমাটোমা আর স্ট্রোক কি এক?

আমরা সাধারণত স্ট্রোক বলতে বুঝি মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ বা রক্ত জমাট বাঁধা। সেই হিসেবে ক্রনিক সাবডুরাল হেমাটোমাকে স্ট্রোক মনে হতেই পারে। তবে একটা ব্যাপার জানা থাকা ভাল যে, স্ট্রোক সাধারণত হয় মস্তিষ্কের ভেতরে, মস্তিস্কের বাইরের আবরণে নয়। আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা তা হল, স্ট্রোক কখনোই আঘাতজনিত কারণে হয়না, স্ট্রোক হয় আপনাআপনি। যদি মাথায় আঘাত থেকে কারো মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয় তবে তা কখনোই স্ট্রোক নয়। সুতরাং, ক্রনিক সাবডুরাল হেমাটোমা স্ট্রোক নয়।

ক্রনিক সাবডুরাল হেমাটোমা নির্ণয় কিভাবে করা যায়?

এটা বুঝা বেশ কঠিন, কেননা বেশ কিছু রোগের লক্ষণ আর ক্রনিক সাবডুরাল হেমাটোমার লক্ষণ প্রায় কাছাকাছি। যেমন মাঝে মাঝে একে স্ট্রোক মনে হতে পারে। আবার, ডিমেনশিয়া বা স্মৃতি ভ্রংশ

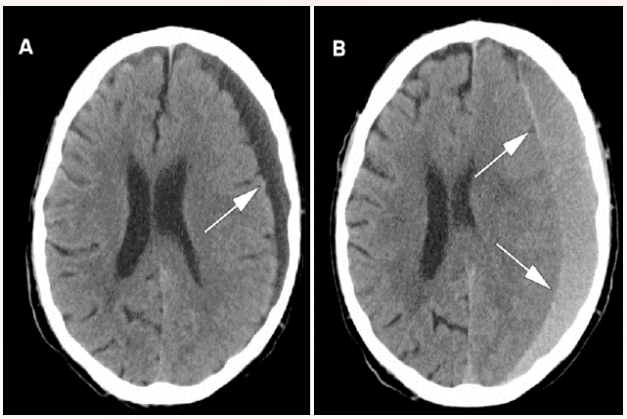

রোগের লক্ষণও একইরকম। মস্তিষ্কে ক্যান্সার হলেও কিন্তু ক্রনিক সাবডুরাল হেমাটোমার মত লক্ষণ হতে পারে।

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে ক্রনিক সাবডুরাল হেমাটোমা নির্ণয় করা সম্পূর্ণ চিকিৎসকের কাজ। আমরা যদি আমাদের কোন আপনজনের এই ধরনের লক্ষণ গুলো দেখি তবে সময় নষ্ট না করে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হব। কেননা, এই রোগ নির্ণয়ে দেরি হলে বা অবহেলা করলে তাতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

ক্রনিক সাবডুরাল হেমাটোমা হলে কোন চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে?

যেহেতু এই রোগে মাথায় অপারেশন লাগতে পারে সেহেতু অবশ্যই একজন নিউরোসার্জনের পরামর্শগ্রহন করা লাগবে। তবে প্রাথমিক অবস্থায় রোগীকে দ্রুত ইমারজেন্সি তথা জরুরি বিভাগে নিয়ে যেতে হবে। কোন কারণে সেটা সম্ভব না হলে যে কোন এমবিবিএস চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। তবে কখনই কোয়াক বা হাতুড়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ঠিক হবে না।

এই রোগের চিকিৎসা কি?

ক্রনিক সাবডুরাল হেমাটোমাতে অনেক সময় অপারেশন লাগতে পারে, সেটা অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে যেমন, রক্তক্ষরণের মাত্রা, রোগীর শারীরিক অবস্থা , মস্তিষ্কে চাপের পরিমাণ ইত্যাদি। হাসপাতালে ভর্তি হলে নিউরোসার্জন রোগীকে দেখে পরীক্ষানিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিবেন।

বাতেন সাহেবকে দিয়ে শুরু করেছিলাম, উনাকে দিয়েই শেষ করি। উনাকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হলে সেইদিনই তার অপারেশন করা হয় এবং ৩ দিন পর উনাকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। যে রোগী প্রায় অজ্ঞান হয়ে হাসপাতালে এসেছিল সে বাড়ি যাচ্ছে হেঁটে হেঁটে।

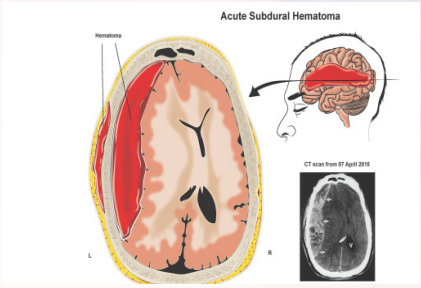

বাতেন সাহেবের হাত ধরে রেখেছে তার একমাত্র নাতনি। একবারের জন্যেও দাদার হাত ছাড়ছে না সে। সে ভেবেছিল তার দাদা আর ফিরে আসবেন না। তাদের দুইজনের চোখেই পানি। এ অশ্রু আনন্দের, এ আনন্দ প্রিয়জনকে কাছে পাওয়ার!!

একজন চিকিৎসকের জন্য এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কি হতে পারে?

ডাঃ শাকিল তানভির
এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য)
নিউরোসার্জারি রেসিডেন্ট, ফেজ-এ,
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভিতরে...

ডা. রুবায়ুল মোরশেদ

দুনিয়া কাঁপানো ২০২০। পৃথিবীর জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি এবং সর্বোপরি রাজনীতিকে লন্ডভন্ড করে দিচ্ছে এর অদৃশ্য ছায়া। এটা কি মানব তৈরি না অন্য কোনো জীব-জন্তু থেকে? কিংবা কোনো বিশেষ 'কন্সপিরেসি থিওরি'? এসব নিয়ে এ-লেখা নয়। ৯/১১ এর পরে যেমন আমরা আর আগের বিশ্বকে পাইনি, তেমনি ২০২০ এর আগের পৃথিবীকেও আগামী বিশ্ব আর কখনো পাবে না। ডিসেম্বরে চীনের উহান নগরে করোনা'র প্রথম আবির্ভাবের পর বিশ্বের প্রায় দুইশো এর বেশী দেশে আজ তা ছড়িয়ে পড়েছে। উহানে সংক্রমণ প্রথমে দ্রুত বিস্তার লাভ করলেও বিশাল চীন সেখানকার পরিস্থিতি ভালোই সামলেছে। অথচ প্রতিবেশী ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশ এই সংক্রমণ ভালোভাবে সামলাতে পারেনি। আমরা স্বাস্থ্যব্যবস্থায় ইউরোপ সহ বিশেষত: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বল দিকগুলো প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবন করলাম; এবং দেশে থেকে দেশে করোনার অসুস্থতা যে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করতে পারে-চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে জড়িত পন্ডিতেরাও এখন ভালো করেই বুঝতে পাচ্ছেন। উন্নত বিশ্বের সংক্রমণ বৃদ্ধি ও মৃত্যুর প্রবণতার সাথে এশিয়াসহ বেশ কিছু অঞ্চলের ব্যবস্থাপনার পার্থক্য চোখে পড়ার মতো। 'জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়' এবং 'ম্যাসাচুসেট্স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি' সহ খ্যাতনামা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নানা গবেষণা ও বিশ্লেষণে এ তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে।

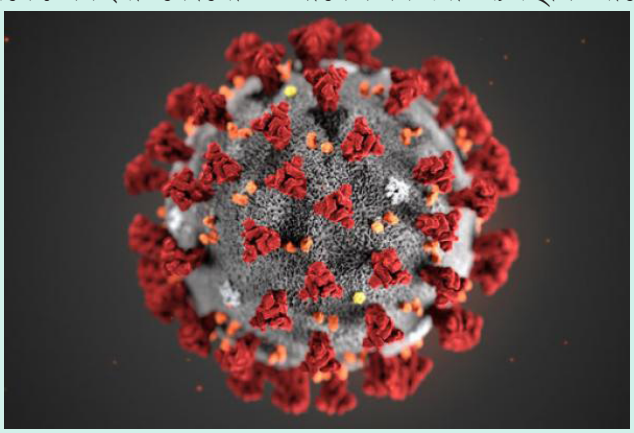

এবার নিজের দেশের কথায় ফিরে আসি। আমার দীর্ঘ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতায় নতুন ক'টি বিষয় উল্লেখ করতে এই লেখার প্রয়াস। মানুষের চরিত্র বদলানো

নাকি খুবই কঠিন কাজ। 'পাহাড়কেও হেলানো যেতে পারে, কিন্তু মানুষের স্বভাবকে?' এদেশে স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্তৃপক্ষ দিনে দিনে একটা বিশেষ চরিত্র নিয়ে বড় হয়েছে। বছরের পর বছর বুড়িগঙ্গার পানি ঘোলা থেকে আরও ঘোলা হয়েছে। জনগণের স্বাস্থ্যের সঙ্গে সমাজ-সংস্কার-অর্থনীতি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তা একাধিক অর্থনীতিবিদ বলে গেলেও, স্বাস্থ্য-প্রেস ব্রিফিংয়ে দেখা গিয়েছে পরিষ্কার করে কথা বলা হয়-না। ধরুন করোনা আক্রান্ত মৃতদেহের প্রসঙ্গ ! অথবা বিভিন্ন ধরনের মাস্ক কিম্বা সামাজিক দূরত্ব সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন তথ্য ! এসবসহ আরও অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় য়ে পরিষ্কারভাবে জনগণ সময় মত জানতে পারেনি। আমরা জানি, স্বাস্থ্য সেবার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত একটা বড়অংশই এর প্রধান ভুক্তভোগী। দেখা গেছে চিকিৎসাকর্মীদের বিশাল অংশ 'পিপিই' সময়মত পাননি। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, চিকিৎসার সাথে জড়িত অধিকাংশ কর্মী 'পিপিই' এর ব্যবহারবিধি সম্পর্কেও যথেষ্ট অবগত ছিলেন না। এবং তাদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়াও হয়নি। যাকে সামগ্রিকভাবে 'বায়োরিস্ক' বলা হয়-সে বিষয়ে চিকিৎসায় জড়িত কর্মীদের মধ্যে সচেতনতা হয়নি। অতীতের ভুলগুলো থেকে এখনই শেখার সময়। স্বীকার করছি Covid-১৯ এর ভয়াবহতা অকল্পনীয়। কিন্তু এটাও তো সত্যি যে এর চেয়ে কয়েকগুণ অন্যান্য রোগীও (Non Covid) ভয়ানক বিপদে পড়েছেন এবং পড়বেন। করোনা-বিহীন এসকল অসুস্থ মানুষদের মৃত্যুর দায় কে নেবে? 'কমনওয়েলথ গোবাল বার্ডেন অব ডিজিস (Commonwealth Global Burden of Disease)' এর প্রতিবেদন বলছে উচ্চ রক্তচাপ, টাইপ টু ডায়াবেটিস, স্ট্রোক, হৃদযন্ত্রের অসুখ; গত আড়াই দশকে বাংলাদেশে মারাত্মক বেড়েছে। বেড়েছে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে অকালমৃত্যু। মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণজনিত অকাল মৃত্যুর হার এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি এখন বাংলাদেশে। আর যক্ষা আক্রান্ত বিশাল জনগোষ্ঠীর কথা-তো না বললেই নয়। করোনা ভিন্ন অসুস্থ রোগীদের বাঁচাতে আমরা বাস্তব কার্যক্রম না নিলে, নিকট ভবিষ্যতে এর মূল্য দিতে হবে আরো ভয়ানকরূপে। আমরা ধীরে ধীরে শিখছি যে আমাদের জীবনযাপন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বর্তমান মহামারির সঙ্গেই খাপ খাওয়াতে হবে।

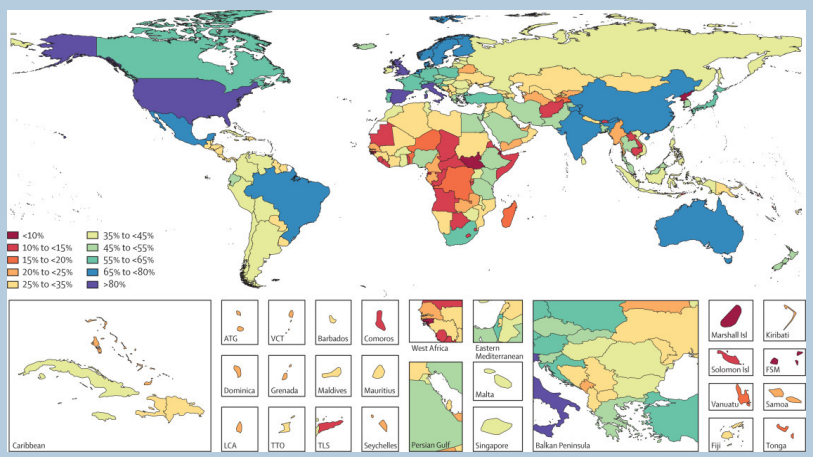

আশা এবং মানবিকতা, মানুষের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। শুধু আতঙ্কের কথা না বলে সতর্কতার এবং ভাল-বাস্তব পরিকল্পনার দিকে অগ্রসর হওয়া এখন সময়ের দাবি। এবং একাধিক মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হবার আগে তা সতর্কতার সাথে আমাদের মোকাবেলা করতে হবে। এটা কিন্তু ১৯১৮ সালের 'স্প্যানিশ ফ্লু' নয়। এখন ২০২০। চিকিৎসাবিজ্ঞান একদম হেলাফেলা করবার স্থানে নেই। আমরা 'তাইওয়ানুকোরিয়ার' মডেল অথবা শ্রীলংকা, ভিয়েতনামের তুলনামূলক সফল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পর্যালোচনা করতে পারি। যেহেতু সময়টা

জটিল, শেষ কথা বলবার এখনো সময় আসেনি। তাই এখন সবার কথাই শুনতে হবে। একদিকে কিছু হাসপাতালকে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল এই সংকটকালের জন্য। এসব হাসপাতালের ক্ষমতা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কেও এখন আমরা অবহিত! বছরের পর বছর সরকার কিন্তু কার্পণ্য করেনি অনেক নতুন হাসপাতাল ও একাধিক ইনস্টিটিউট তৈরি করতে। অঢেল অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে সরকারি কর্তৃপক্ষকে। আফসোস! এখনো এদেশের প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ লোকই বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে এই সংকটকালে অনেকে নতুন নতুন হাসপাতাল তৈরির কথা বলে। মনে রাখতে হবে হাসপাতাল কিন্তু 'সাইক্লোন শেল্টার' নয়। আমরা এই মুহূর্তে যে ধরনের হাসপাতাল তৈরির কথা বলছি, সেটাতো আরও বিশদ ব্যাখ্যার দাবি রাখে। 'সার্স'র শিক্ষাকে পুঁজি করে সিঙ্গাপুর তাদের অনেক হাসপাতালকে ঢেলে সাজিয়েছিল। সেটা ২০০৩ সালের কথা। আজ এর সুফল তারা ভোগ করছে। এখনো আমাদের অনেক হাসপাতালে (যেহেতু এদেশে যক্ষা যথেষ্ট পরিচিত রোগ) 'নেগেটিভ প্রেসার ফ্লোর', ফিল্টার ইত্যাদি ব্যবস্থার কনসেপ্টই নেই। এ ছাড়াও আরও আছে হাসপাতালে আনুষঙ্গিক জরুরি কিছু বিষয়। ভেন্টিলেটরের কথা শুনছি প্রতিনিয়তই। এটা সত্য যে, আমাদের দেশে ভেন্টিলেটরের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক অনেক কম। তাও মূলত ঢাকা আর চট্টগ্রাম শহরে সর্বোচ্চ। প্রায়শই ভেন্টিলেটর বিদেশ থেকে আমদানি করতে দেখি। অথচ এসব অত্যাধুনিক যন্ত্রের পেছনে যে ডাক্তার, নার্স, টেকনিশিয়ানকে দিনরাত্রি দাঁড়িয়ে তাদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে আমরা দক্ষ করতে পারিনি। কখনো কখনো অপর্যাপ্ত ট্রেনিং দেওয়া হলেও তার আপডেট করা হয় না।

একদিকে, দেখা যায় হাসপাতালে যন্ত্র ক্রয়ে এক আনন্দ! অন্যদিকে, পর্যায়ক্রমে এসব চালাতে গিয়ে সৃষ্টি হয় অসীম বেদনার! অবশ্যই এর ব্যতিক্রমও আছে। 'আই সি ইউ' তৈরি করা তো এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহের বিষয় নয়। এতে দক্ষ-অভিজ্ঞ জনবল তৈরি করা সময়ের ব্যাপার। যত দ্রুত এই প্রশিক্ষণ শুরু হবে ততই মঙ্গল। আধুনিক ভেন্টিলেটরের কার্যক্ষমতা ব্যাপক। শেখার অনেক কিছু আছে। যেমন, একটা স্মার্টফোনের অনেক ক্ষমতা। কিন্তু, তার কিয়দংশই আমরা বেশিরভাগ জনগণ ব্যবহার করে থাকি। তেমনি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না থাকলে আধুনিক

ভেন্টিলেটরেরও সদ্ব্যবহার করা হবে না। এছাড়াও 'আই সি ইউ' তে ছোট-মাঝারি অনেক যন্ত্রপাতি রয়েছে। তাদের প্রয়োজনীয়তাও সীমাহীন। 'আই সি ইউ' গুলোতে দেখা যাচ্ছে বাড গ্যাস অ্যানালাইজার, কার্ডিয়াক মনিটর চালাতেও দক্ষ জনবল পাচ্ছি না আমরা। এমনকি, সাকার-মেশিনে 'সাকশন' দেওয়াটাও ভালো করে শিখতে হয়। ভুক্তভোগীরা জানেন, সেখানেও মাঝে-মধ্যে কী হয়! 'সি প্যাপ'র গুরুত্ব বাড়াতে হবে। অক্সিজেনের পর্যাপ্ত সরবারহের কথাতো অনেক পুরানো। 'আই সি ইউ' পুরো হাসপাতাল থেকে ভিন্ন। তাদের জনবলের গুরুত্ব ও সম্মানকে মূল্যায়ন করতে হবে। তবেই স্বল্প, মধ্যম ও সুদূরপ্রসারী ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে এই বিপদ কেটে যেতে পারে।

প্রসঙ্গত উলেখ্য যে, যন্ত্রপাতি কেনাকাটার সঙ্গে আরও প্রয়োজন সেসবের রক্ষণাবেক্ষণ। বিদেশের হাসপাতালগুলো বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করে রক্ষণাবেক্ষণে। আমাদের দেশেও বর্তমান সরকারি হাসপাতালগুলো ও অত্যাধুনিক বেসরকারি হাসপাতালগুলোর দিকে তাকালেই এর পার্থক্য বোঝা যায়। টেস্ট, টেস্ট, টেস্ট বলা হয়েছে এবং হচ্ছে। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ। সেদিন শুনলাম, ২,০০০ শয্যার হাসপাতাল নাকি তৈরি করতে ইচ্ছুক কেউ কেউ ! এর জন্যে যে পরিমাণ জায়গা তারা দেখাচ্ছেন সেখানে একটি আধুনিক হাসপাতাল করতে চাইলে খুব বেশি হলে ২৫০ শয্যার হাসপাতাল হতে পারে। ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে অল্প দিয়েই শুরু করুন। আপনারা ২০ থেকে ৫০ শয্যা দিয়েই শুরু করুন না! ভারতের ভেলোরে অবস্থিত বিখ্যাত হাসপাতালটি মাত্র 'এক বেড' দিয়েই শুরু হয়েছিল। এরকম আরও কাহিনী আছে। কিন্তু, দয়া করে সর্বোচ্চ মানটা ধরে রাখুন। আরেকটি কথা না বললেই নয়, দেশের চারিদিকে বেশকিছু অকার্যকর হাসপাতাল আছে। সেগুলোকে 'মানুষ' করুন। অবশ্যই নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিখুঁত করা সব সময় জরুরি। কিন্তু সংকটের প্রথম দিন থেকেই অভাব বোধ করেছি, 'IEDCR' এর সাথে সাথে আরও অন্তত দু-একটা ল্যাবরেটরির এবং গবেষণার অত্যধিক প্রয়োজনীয়তা। ১৬ কোটির অধিক জনসংখ্যার দেশ বাংলাদেশ। জ্ঞান বিদ্যা চর্চা করার জন্য দেশে এখন অনেক বিদ্বান আছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান আজ ১০০ বছর হতে সসম্মানে দাড়িয়ে (প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯২১)। যেখানে জাপান, অস্ট্রেলিয়া থেকে শুরু করে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকার প্রচুর শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত মেধাসম্পন্ন জ্ঞানীগুণীদের অবস্থান। প্রচুর দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন জনবল রয়েছে তাদের। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন কর্মীদের নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাগারে তৈরি করা তাদের জন্য খুবই সম্ভব। অবশ্যই 'বায়োসেফটি প্রটোকল' অনুসরণে তারা সক্ষম। সব কিছুর ঊর্ধ্বে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নত ফ্যাকাল্টি সমূহের (বিশেষ করে মেডিসিন ও সায়েন্স ফ্যাকাল্টি সমূহ) এখনই তো দেশাত্মবোধ প্রদর্শন ও ত্যাগের শ্রেষ্ঠ সময়। আমরা অচিরেই শুনতে চাই আমাদের সম্পূর্ণ নিজস্বে গড়ে ওঠা গবেষণাগার ও অভিজ্ঞতার কথা। খুঁজে দেখুন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন গবেষণাগার-

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশি চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা সম্মানের সাথে, সুনামের সাথে কাজ করছেন। তারা এই দেশেরই গ্র্যাজুয়েট, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট। উন্নত বিশ্ব যেন চীন-ভারতের মতো বাংলাদেশকেও এক দিন অনুরোধ করে ওষুধ ও প্রশিক্ষণের জন্য। আমরা যেন বিদেশীদের কথায় অতিমাত্রায় নির্ভরশীল না হই ! তাদের থেকে অনেক অনেক কিছু ঠিকই শেখার আছে। কিন্তু বিদেশি অনেক স্বাস্থ্য 'তত্ত্ব ও তথ্য' আর কারিগরি কৌশলকে আমাদের দেশের মতো করেই সাজাতে হবে, 'কাস্টমাইজ' করতে হবে দেশীয় প্রয়োজনীয়তায়। আমরা যেন হীনমন্যতায় না ভুগি। বিশাল এই জন্মভূমিতে গবেষণার সুবর্ণ সুযোগ আমরা হাতছাড়া করতে চাই না।

গত দেড় দশকে চোখের সামনেই পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সামগ্রিক জনস্বাস্থ্যে না হলেও বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি দেখলাম আমরা। আরও দেখলাম তাদের মেডিকেল শিক্ষার অগ্রগতি ও বিশেষত গবেষণায় বিশেষ অর্জন। বিভিন্ন সামাজিক সূচকে আমাদের উন্নতির কথা শুনলেও বুঝতে পারছি যে স্বাস্থ্য-শিক্ষা-গবেষণায় আমাদের আত্মতৃপ্তিতে ভুগবার মতন সময় এখনো আসেনি। উপরে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের' কথা বললেও, ভয়ও লাগে ! কারণ কথায় আছে, আমরা শুরু করি কিন্তু শেষ করি না। প্রতিযোগিতায় যাই, অংশগ্রহণ করবার জন্য, জিতবার জন্য নয়। কিছুদিন আগেই দেখেছিলাম, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের স্বাস্থ্য কৌশল অনুযায়ী বাংলাদেশে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য খরচের ব্যক্তিগত পরিমাণ আবারও পরিবর্তন করবার পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নেই প্রয়োজনীয় সরকারি-বেসরকারি সমন্বয়ের উদ্যোগ। যেমনি নেই আজ বর্তমানের এই মহাসঙ্কটেও।

অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলতে হয় চিকিৎসক সমাজের কথাও; গবেষণার প্রতি অবহেলা, সময় অব্যবস্থাপনা, উনাদের কর্মস্থলের দুর্বল পরিবেশ নিয়ে। আজও সমন্বয়হীনতা রয়েছে ক্লিনিশিয়ান, বেসিক সায়েন্স, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় জড়িত মূলত চারটি ডিসিপ্লিনের মাঝে। বেসিক সায়েন্সে মেধাবী লোকদের গবেষণার সুযোগ নেই। 'স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা' এখনো আধুনিক বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতি পেল না। সাঁতারের প্রশিক্ষক হয়তো অনেক আছেন; কিন্তু নিজেই হয়তো সাঁতার জানেন না। ক্লিনিশিয়ানদের সাথে সেবিকাদের 'যৌথ কার্যক্রম'ও ব্যর্থতায় ভরা !

সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য এই যে, উপর্যুক্ত সবক'টি বিভাগেই প্রত্যক্ষভাবে আমার কাজ করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। আমাদের নিজেদের ভেতর সমন্বয়ের অসংগতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধার অভাব এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অযাচিত ইগো-অহংকার আমাদের আজকের করুণ জনস্বাস্থ্যের একটি অন্যতম কারণ। এমনিতেই জনবহুলতা, বসবাসের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যহীনতার করুণ চিত্র এবং উচ্চমাত্রার ব্যাপক পরিবেশের দূষণে অতি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে আমরা। সব কিছু মিলে আজকের এই অকল্পনীয় স্বাস্থ্য সংকট অর্থনৈতিক সংকটে

পরিণত হতে পারে। এখনো আমরা এন-৯৫ মাস্ক, সার্জিক্যাল মাস্ক, সাধারণ কাপড়ের মাস্ক কোনটা কি বস্তু এ বিষয়ে স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে পারিনি। 'পিপিই'র প্রসঙ্গতো আছেই। এসব কিন্তু ক্লিনিশিয়ানের একমাত্র কাজ নয়। তাদের এর চেয়েও কঠিন কাজ আছে। বহুদিন ধরেই দেখছি জনপ্রিয় কোন কোন ডাক্তার অর্থাৎ প্রচুর রোগী দেখেন বা বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে শক্তিশালী তাদেরকেই

প্রশাসনের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উঁচু উঁচু পদে বসানো হয়। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিন্তু সাধারণ জনগণ। একদিকে মেডিকেল শিক্ষার্থীরাও শিক্ষককে পাচ্ছে না। অন্যদিকে, সময়মতো রোগীরা দেখা পায় না ওই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের। প্রশাসনের 'জটিল ভুবনে' ব্যস্ত থেকে উনারা হয়তো দৌড়াচ্ছেন দেশে-বিদেশে, মিটিংয়ে-সিটিংয়ে।

আমরা আরো অবগত, আমাদের স্বাস্থ্যসেবার একটা বড় দুর্বলতা যে প্রয়োজনের তুলনায় দক্ষ চিকিৎসক ও নার্সের অপ্রতুলতা। এক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় আমরা সবার পিছনে। আমাদের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো কিন্তু সারাদেশে প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। তাদের অবকাঠামোর(অর্থাৎ দালানকোঠা, টেবিল, চেয়ার, অর্ধমৃত এম্বুলেন্স, অব্যবহৃত যন্ত্র, পুরনো বেড) পেছনেও অনেক খরচ সরকারের। কিন্তু স্বাস্থ্য-জনবল তৈরির নীতিমালাতে একেবারে বেহাল অবস্থা ! নতুন করে সাজানোর কোন বিকল্প নেই। জাতির স্বাস্থ্য ভঙ্গুর হলে সামগ্রিক অগ্রগতি যে থমকে যায়, তা আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। করোনাভাইরাস একসময় চলে যাবে। ভবিষ্যতে কিন্তু আরও বিপজ্জনক সংক্রামক রোগের আবির্ভাব হতে পারে। হয়তো আমরা অচিরেই জিকা ভাইরাসের কথা শুনব অথবা অন্য কোনো ভাইরাসের কথা। তার জন্য আগেভাগেই প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন।

'জনস্বাস্থ্য রক্ষার চেয়ে রাষ্ট্রের অর্থনীতির স্বাস্থ্য ভালো রাখা জরুরি' বলে যে সকল অর্থনীতিবিদ মনে করেছেন-তা আজকের এই মহাসঙ্কটে ভারত, যুক্তরাষ্ট্রকে দেখে তাদের ভুল আশা করি ভাঙবে। দেশি-বিদেশি সংবাদ ও সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে সাধারণ মানুষ আজ দিশেহারা। আমরা বেশি কথা বলতে পছন্দ করি এটা নতুন কিছু নয়। বলতে শুরু করলে অন্য আর কারো কথা শুনতেও চাই না। আমাদের সামগ্রিক কথোপকথনে 'আমরা' শব্দটা দুর্লভ। 'আমিত্ব' থেকে বের হবার এখনই শ্রেষ্ঠ সময়। এখন তো ঘরে অনেক বেশি সময় কাটাই-মনে হয় কি?

"খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার, এই তোমাদের পৃথিবী, এর বাইরে জগত আছে তোমরা মানো না"...।

হার্টের নানান রোগঃ চিকিৎসা ও প্রতিকার

বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশসহ অন্যান্য উন্নতশীল দেশে সংক্রামক ব্যাধি কমার সাথে সাথে জীবনধারার পরিবর্তন, যেমন- কায়িক পরিশ্রমের অভাব, তামাকের ব্যবহার, অসম খাবার গ্রহন এবং অতিরিক্ত মানসিক চাপ ইত্যাদির প্রভাবে অসংক্রামক ব্যাধি বিশেষ করে হৃদরোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিক, বক্ষব্যাধি বিরাট স্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী পৃথিবীতে মোট মৃত্যুর শতকরা ২৯ ভাগ হয়ে থাকে হৃদরোগ জনিত কারনে, এজন্য একে বিশ্বের এক নম্বর ঘাতক ব্যাধি বলা হয়ে থাকে। বিশ্বে প্রতিবছর ১ কোটি ৭১ লাখ লোক এই রোগে মারা যায়। যার মধ্যে শতকরা ৮২ ভাগ মৃত্যু হয় নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোর জনগণের। এই মৃত্যু খুবই হতাশাজনক। কারন হৃদরোগ এবং স্ট্রোকসহ বিভিন্ন রোগে যারা মারা যায় তাদের অর্ধকেরই বয়স হয় জীবনের সবচেয়ে সুন্দরতম সময় এবং কর্মজীবন ১৫-৬৯ বছরের মধ্যে। বাংলাদেশে সকল ধরনের হৃদরোগ, যেমন- উচ্চ রক্তচাপ, করোনারি বা ইসকিমিক হৃদরোগ, বাতজ্বর জনিত হৃদরোগ এবং জন্মগত হৃদরোগ বিদ্যমান আছে। সুস্বাস্থ্য মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন নিয়ামক। একজন সুস্থ মানুষই পারে নিজের জীবনের

পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখতে। এটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো সুস্থ জনগোষ্ঠী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে সুস্বাস্থ্যের সংজ্ঞা হলো- কেবলমাত্র শারীরিক অসুস্থতার অনুপস্থিতই সুস্থতা নয়, বরং সুস্থতা হলো শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও প্রাণবন্ততা। মানুষ প্রকৃতির অংশ এবং প্রকৃতির সকল নিয়মাবলীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। আর সময়ের সাথে সাথে স্বাস্থ্যগত অবস্থায় আসে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন। তাই প্রয়োজন সুশৃংখল ও নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন, যা তাকে দেবে পরিপূর্ন শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক প্রশান্তি।

আজকের পৃথিবীতে সংক্রমক রোগের তুলনায় অসংক্রমক ও প্রতিরোধযোগ্য রোগের প্রকোপ অনেক বেশি। দক্ষিন এশিয়া ও নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশসমূহে মানুষের এসব রোগের আক্রান্ত হওয়ার কারণ অনেক বেশি, বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। অসংক্রমক রোগ সমূহের মধ্যে হৃদরোগ বর্তমান বিশ্বে এক মহামারির নাম এবং এক নম্বর ঘাতক ব্যাধি। বর্তমানে বয়স, শ্রেনী, পেশা নির্বিশেষে সকল ধরনের মানুষ হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছে। জীবনাচরণে নেতিবাচক পরিবর্তন ও অসচেনতাই এক্ষেত্রে প্রধানতম ভূমিকা পালন করছে। হৃদরোগ থেকে মুক্ত থাকতে হলে এর নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে এবং ঝুঁকিসমূহ জানতে হবে।

হৃদরোগের ঝুঁকিসমূহ

- উচ্চ রক্তচাপ
- তামাক ও তামাক জাতীয় পদার্থ গ্রহন
- উচ্চ কোলেস্টেরল
- অপর্যাপ্ত কায়িক শ্রম
- অতিরিক্ত শারীরিক ওজন
- ডায়াবেটিস
- সুষম খাদ্য গ্রহনে অসচেতন
- মানসিক চাপ

হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব শুধুমাত্র কোন রাষ্ট্র, সংগঠন, নীতি- নির্ধারক বা বিশ্ব নেতৃবৃন্দের উপর বর্তায় না, এ দায়িত্ব ব্যাক্তির নিজের। বিশ্বের যে যেখানে আছে সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে হৃদরোগ ঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে জানবে, সচেতন থাকবে এবং নিজ নিজ পারিবারিক পরিমন্ডলকে ঝুঁকিমুক্ত রাখবে। ফলে সর্বত্র হৃদরোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার হবে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ও কাঙ্খিত। হৃদরোগের ঝুঁকিসমূহ জানার পাশাপাশি হৃদরোগ প্রতিরোধ করণীয় বিষয়েও জানতে হবে।

- রক্তচাপ নিয়মিত নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
- তামাককে না বলুন এবং পরোক্ষ ধুমপানের প্রভাবমুক্ত থাকুন।
- রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়মিত পরিক্ষা করুন।
- নিয়মিত ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রম করুন।
- খাদ্যাভ্যাস নিয়ে সচেতন হোন।
- মানসিক চাপমুক্ত থাকুন।
- বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

আমরা সবাই জানি, বাঁচতে হলে জানতে হবে এবং জানাকে মানায় রুপান্তর করতে হবে। এটি সুস্থতার একাট অন্যতম প্রধান শর্ত। নিয়ম তান্ত্রিক ও সুশৃংখল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া ও এতে অন্যদের উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে মানুষ সুস্থতার এক চমৎকার পরিবেশ (আবহ) তৈরি করতে পারে। পরিবারের সদস্যদের হার্ট সুস্থ রাখার জন্য পারিবারিক জীবনে কিছু নিয়ম মেনে চলার ঐতিহ্য তৈরি করা যায়। এই নিয়মগুলোকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন-

১.বাড়িতে সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, সাদাপাতা, গুল সহ সকল প্রকার তামাকের ব্যবহার সম্পুর্ন নিষিদ্ধ করুন। বাড়ির সদস্যদের মধ্যে তামাক, তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের অভ্যাস না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এতে করে পরোক্ষ ধূমপানের প্রভাব থেকেও পরিবারের সদস্যরা মুক্ত থাকবে, যা সবার হার্টের সুস্থতার

জন্য সহায়ক। একটি প্রমানিত সত্য হলো- তামাক গ্রহন করোনারি হৃদরোগের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ন নিয়ামক। তাই ধূমপানসহ সকল ধরনের তামাক গ্রহন থেকে সবাই মুক্ত রাখার বিষয়টি পারিবারিক আদর্শে রুপান্তর করতে হবে। পরিবারের সকলকে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

২. পরিবারের সকলের মধ্যে প্রতিদিন শাকসবজি ও ফলমূলসহ স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন

. বাইরের প্রক্রিয়াজাত খাবার গ্রহণের পরিবর্তে বাড়িতেই স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরি করা এবং তা গ্রহণে পরিবারের সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। স্কুল বা অফিসে বাসায় তৈরি খাবার দিতে হবে।

. প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় পর্যাপ্ত পরিমানের শাক-সবজি রাখতে হবে। বিশেষ করে পরিবারের প্রত্যেককে বয়সভেদে দিনে ২ থেকে ৩ বার শাক-সবজি খেতে হবে।

. অতিরিক্ত চিনিযুক্ত খাবার গ্রহণের প্রবনতা থেকে মুক্ত হতে হবে।

. দিনের শুরুতে একটি করে ফল খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। এছাড়াও প্রচুর পরিমানে মৌসুমী ও দেশি ফল খেতে হবে।

. স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণে পরিবারের সকলের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। কারন এ ধরনের খাবারে সম্পৃক্ত চর্বি ও লবনের পরিমান কম থাকে।

. পরিবারের দৈনিক খাবারের আয়োজন এমন হওয়া প্রয়োজন যেন তাতে সকলের জন্য সুষম খাদ্য গ্রহণ নিশ্চিত হয়।

৩. পরিবারের সবাইকে খেলাধুলা সহ অন্যান্য শারীরিক পরিশ্রম করতে উদ্বুদ্ধ করুন

. নিজের কাজ নিজে করার চেষ্টা করতে হবে, পরিবারের ছোট-বড় সকল সদস্যদের মাঝে এই অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। প্রতিদিন মাত্র ৩০-৪০ মিনিট শারীরিক পরিশ্রম হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক প্রতিরোধে সাহায্য করে।

. সব বয়সীদের জন্য ওই টেলিভিশন দেখার সময়কাল সীমিত করতে হবে। দৈনিক ২ ঘন্টার বেশি টেলিভিশন দেখা উচিত নয়।

. পরিবারের সদ্যস্যদের নিয়ে ঘরের বাইরে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন সাইক্লিং, হাটা, দড়ি লাফ খেলা অথবা বাগানে বা ছাদে বিভিন্ন ধরনের খেলার আয়োজন করা যেতে পারে।

. সম্ভব হলে গাড়ির পরিবর্তে হেঁটে বা সাইকেলে করে বাসা থেকে গন্তব্যে যাওয়া। বাসে যারা যাতায়াত করেন তারা নির্ধারিত স্থান থেকে এক স্টপেজ আগে নেমে হেঁটে গন্তব্যে পৌছানোর অভ্যাস করুন।

. লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ি ব্যবহার করার অভ্যাস করা।

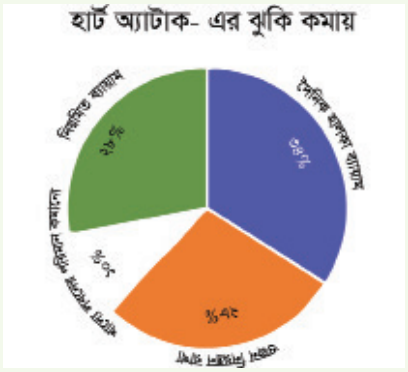

. নিজ বাসায় বাগান করার কাজ, যেমন ঘাস কাটা, ঝরা পাতা কুড়ানো, আবর্জনা পরিষ্কার করা, মাটি খনন করা, গাছের ডালপালা ছাটাই করা, পানি দেয়া ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে শারীরিক পরিশ্রম সম্ভব। এসব কাজে প্রকৃতির কাছাকাছি থাকার সুযোগ হয় বলে মনে আনন্দভাব থাকে এবং মানসিক চাপ কমে।

৪. হৃদরোগের ঝুঁকির মাত্রা জেনে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করুন

. একজন স্বাস্থ্যকর্মী বা ডাক্তারের নিকট থেকে নিজের রক্তচাপ, কোলেস্টরল এবং গ্লুকোজের মাত্রা, কোমর ও নিতম্বের আনুপাতিক পরিমাপ এবং বডি মাস ইনডেক্স জেনে নেয়া।

. উল্লিখিত বিষয়গুলোর ঝুঁকির মাত্রা জানা হয়ে গেলে হার্টকে সুস্থ রাখা এবং হার্টের অবস্থর উন্নতির জন্য সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করা ও পদক্ষেপ গ্রহন করা।

. এই পরিকল্পনা বাসায় এমনভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখা প্রয়োজনে যেন তা মেনে চলা সহজ হয়।

এসব নিয়ম মেনে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের যে কেউ, যে কোনো পরিবার হৃদরোগের প্রকোপ থেকে অনেকটাই মুক্ত থাকতে পারবে। তবে এও সত্য যে, হৃদরোগর পিছনে ক্রিয়াশীল সকল সমস্যা প্রতিরোধযোগ্য না। সেজন্য প্রয়োজন হার্টের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাধারন জ্ঞান।

একজন মানুষের হার্ট এ্যাটাক বা স্ট্রোক হলে বোঝার উপায় এবং তাৎক্ষণিক করণীয় বিষয়ের প্রাথমিক ধারণা থাকলে বিপর্যয়ের পরিমান কম হতে পারে। শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ কার্ডিয়াক এবং শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত জটিলতা

বাড়িতেই সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই লক্ষণ বিবেচনা করে করণীয় বিষয়ে প্রাথমিক ধারনা থাকলে এই সকল পরিস্থিতে পরিবারের উপস্থিত সদস্যরাই আক্রান্ত ব্যক্তিকে সহযোগিতা করতে পারে। প্রয়োজনে জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসকের শরনাপন্ন হওয়া ও হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারে। হার্ট এ্যাটাক এবং স্ট্রোকের লক্ষণ বা উপসর্গগুলোতে ব্যক্তিবিশেষে ভিন্নতা থাকে।

৫. বাসস্থানে হার্টবান্ধব পরিবেশ

আপনার বাসস্থান কতটা হার্টবান্ধব তা জানুন।

দৈনন্দিন জীবন যাত্রার কিছু পরিবর্তন নিজের পরিবারের সদস্যদের হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে পারে।

বাড়িতে স্বাস্থ্যকর খাদ্যের পরিবেশ রাখুন-

. অধিক চিনি, লবণ ও তৈলাক্ত খাদ্য পরিহার করুন।

. মিষ্টি ও মিষ্টি জাতীয় খাবারের পরিবর্তে বেশি করে ফলমূল ও শাক-সবজি খাওয়ার অভ্যাস করুন।

. স্কুল ও কর্মক্ষেত্রের জন্য বাড়িতে খাবার তৈরি করুন।

বাসস্থানে ধূমপান নিষিদ্ধ করুন

. নিজের, নিজের সন্তানদের, অতিথি ও যারা আপনার বাসায় কাজ করে তাদের জন্য ধূমপান মুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে বাড়িতে ধূমপান নিষিদ্ধ করুন।

. ধূমপায়ী হলে ধূমপান ত্যাগ করে নিজের সন্তানদের জন্যে রোল মডেল হোন।

. পরোক্ষ ধূমপানের কারণে প্রতিবছর ৬ লক্ষ অধূমপায়ী ও শিশুদের মৃত্যু হয়- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

.নিজের পরিবারের সদস্যদের হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি সম্পর্কে জানুন

. চিকিৎসকের সাথে সাথে যোগাযোগ করে রক্তচাপ, রক্তে কোলেস্টেরল ও শর্করা, শারীরিক ওজন এবং Body Mass Index (BMI) জেনে নিন।

. পরিবারের কোনো সদস্য হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকিতে থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন সুস্থ থাকুন।

. চিকিৎসকের কাছে হৃদরোগের লক্ষণ সম্পর্কে জানুন যা পরিবারের সদস্যদের উপকারে আসবে।

. পরিবারের কোনো সদস্য হৃদরোগ অথবা স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে দ্রুত চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করুন

৬. কর্মক্ষেত্রে হার্ট বান্ধব পরিবেশ

কর্মক্ষেত্র, স্কুল ও হাসপাতাল সমূহে হার্ট বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করুন। সামান্য কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্র এবং শিশুদের স্কুলে হার্ট বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা যায়।

. ধূমপানকে না বলুন

. কর্মক্ষেত্রে ধূমপান নিষিদ্ধ এবং সহকর্মীরা যারা ধূমপান ত্যাগ করতে চায় তাদের সহযোগিতা করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানান।

. কর্মক্ষেত্র ধূমপানমুক্ত রাখার জন্য সহকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করুন।

. খেলার মাঠ, স্কুল এবং হাসপাতাল অথবা কর্মক্ষেত্রের ধূমপানের জন্য নির্ধারিত স্থান থাকলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করুন।

কর্মক্ষেত্রের শারীরিক পরিশ্রম

. সাইকেলে অথবা হেঁটে কর্মক্ষেত্রে যান অথবা বাস থেকে এক স্ট্যান্ড আগে নেমে কিছু দূর হাটুন।

. নিজে সিড়ি ব্যবহার করুন এবং অন্যদের সিড়ি ব্যবহারে উৎসাহিত করুন।

. সহকর্মীদের মধ্যে হাঁটার অভ্যাসের জন্য উৎসাহিত করুন এবং প্রয়োজনে হাটার প্রতিযোগিতা আয়োজন করুন।

. মোবাইলে কথা বলার সময় দাড়িয়ে কথা বলার চেষ্টা করুন।

নিজের খাবারের প্রতি দৃষ্টি রাখুন

. স্কুলে, কর্মক্ষেত্রে, হাসপাতাল এবং ক্লিনিকে স্বাস্থ্যকর খাবারের ব্যবহার চালু করুন।

. মানসিক চাপ কমান

. অতিরিক্ত মানসিক চাপ যদিও হৃদরোগের সরাসরি ঝুঁকি নয়, তবে মানসিক চাপ অতিরিক্ত ধূমপান, মদ্যপান ও অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহনের অন্যতম কারন। এ সবই হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

. মুক্ত বাতাস ও সামান্য পরিশ্রমের জন্য দুপুরের খাদ্য গ্রহন নিজের কাজের স্থান থেকে একটু দূরে করুন।

. কর্মক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় পর পর কাজে বিরতি এবং ৫ মিনিট শারীরিক পরিশ্রম করুন।

৭. খেলাধুলার পরিবেশ হার্টবান্ধব করুন

শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা হৃদরোগের অন্যতম কারন, যা কিনা ওজন বৃদ্ধি, উচ্চ রক্ত চাপের কারণ। বিশ্ব হার্ট দিবসে সবাইকে আরো বেশি সক্রিয় হবার অনুরোধ জানায়। স্বাস্থ্যকর কর্মক্ষেত্র দ্বারা নিজে উপকৃত হবে, ব্যবসা বাণিজ্য উৎপাদন মূখী হবে এবং সহকর্মীদের অনুপস্থিতি কমবে-বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

. শিশুদের সক্রিয় থাকতে উৎসাহিত করুন

. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ৫ থেকে ১৭ বছরের শিশুদের কমপক্ষে ১ ঘন্টা শারীরিক পরিশ্রম করা উচিত।

. সাইকেল বা এক সাথে হেটে শিশুদের স্কুলে যেতে ব্যবস্থা করুন।

. শুধুমাত্র খেলাধুলা নয়, হাটা এমন কি গৃহস্থালির কাজও শরীর সক্রিয় রাখে।

. সারাদিনে বেশি টেলিভিশন দেখা বা কম্পিউটার ব্যবহার করা উচিত নয়।

. শিশুদের খেলাধুলার জন্য, সাইকেল ও হাঁটার জন্য নিরাপদ রাস্তা ইত্যাদির জন্য জনমত তৈরি করুন।

সবাই মিলে একসাথে কাজ করলে ২০২৫ সালের মধ্যে হৃদরোগজনিত অকাল মৃত্যুর হার শতকরা ২৫ ভাগ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে-বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

৮. নিজে সক্রিয় থাকুন

. প্রতি সপ্তাহে ১৫০ মিনিট শারীরিক পরিশ্রম করার জন্য এখনই অল্প অল্প শারীরিক পরিশ্রম শুরু করুন।

. শারীরিক পরিশ্রমের সম্পর্কিত তথ্য চিকিৎসকের নিকট থেকে জেনে নিন।

. শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্বেও কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রম স্বাস্থ্যের জন্য ভাল সহায়ক।

শারীরিক সক্রিয়তা

. হাঁটা জগিং. সাঁতার কাটা ও সাইকেল চালানো ইত্যাদি শারীরিক পরিশ্রমগুলোর মধ্যে অন্যতম।

. সিঁড়ি দিয়ে উঠা, উচ্চস্থানে হাঁটা এবং বাগান করা ইত্যাদি ওজন ঠিক রাখতে সহায়তা করে।

. যোগ ব্যায়াম শরীরের অলসতা দূর করে।

বিশ্বের দেশে দেশে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে হৃদরোগ জীবনবিনাশী অন্যতম রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর উন্নয়নশীল দেশে এ রোগের বিস্তার ক্রমেই বাড়ছে। নারীদের মধ্যে হৃদরোগ আশংকাজনক হারে বাড়ছে। এ জন্য নারীদের মধ্যে হৃদরোগ প্রতিরোধের উদ্যোগ বেশি দেখা দিচ্ছে। হৃদরোগ প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপুর্ন দিক হলো হার্ট এ্যাটাক, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরন (স্ট্রোক) ও কার্ডিয়াক অ্যারেস্টেও সতর্ক সংকেত সম্পর্কে জানা। হৃদরোগ প্রতিরোধে অন্যতম ভূমিকা রয়েছে খাদ্যবিধির।

হৃদরোগ প্রতিরোধে পুষ্টি-কৌশল

. লবন খাবেন কম-দৈনিক লবন খেতে পারেন ২৩শ মিলিগ্রামের কম। কারও যদি উচ্চ রক্তচাপ থেকে থাকে, তাহলে তাকে দিনে ১৫শ মিলিগ্রাম পরিমান লবন বা এর চেয়ে কম গ্রহন করা উচিৎ।

. চর্বিযুক্ত খাবার বাদ দেয়াই ভালো-খাদ্যে সম্পৃক্ত চর্বি মোট ক্যালরির সাত শতাংশের চেয়েও কম থাকা উচিৎ। দিনে ১৫-২০ গ্রামেরও কম। ট্র্যান্সফ্যাট থাকা উচিত এক শতাংশেরও কম। ট্র্যান্সফ্যাট একেবারে না খেলে আরও ভালো। সম্পৃক্ত চর্বি ও ট্র্যান্সফ্যাট হলো মন্দ

চর্বি। চর্বিযুক্ত গোশত, চর্বিবহুল দুগ্ধজাত খাদ্য (ঘি, মাখন, দুধ) পাম কার্নেলভেল, নারকেল তেল আমাদের খাদ্যে অনেক কম গেলেও এখন ভাজা খাবার, ফাস্টফুট, ক্র্যাকারস, ডোনাট, কেক, পেস্ট্রি, মিঠাইয়ের রমরমা বাজার। এসব বাদ দিতে হবে।

. খাদ্যে যত কম কোলেস্টেরল থাকে তত ভালো-দিনে ৩০০ মিলিগ্রামের চেয়ে কম কোলেস্টেরল যেন থাকে খাদ্যে। ডিমের কুসুম. চিংড়ি, গলদা চিংড়ি, মগজ, কলিজা এসব পরিহার করতে হবে। অন্তত কম করে খাবেন এসব খাবার। দিনে ডিমের একটি কুসুমের বেশি নয়।

. দ্রবনীয় আশঁ বেশি বেশি খাবেন-বেশি মটরশুঁটি, শিমের বিচি, বিনস, ওটমিল (জইচূর্ন), ফল,শাকসবজী।

হৃদরোগীর খাবার

হৃদরোগের প্রধান কারন রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকা। পরিকল্পিত খাদ্য গ্রহণনীতি মেনে চললে এই কোলেস্টেরল আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। রক্তে কোলেস্টেরল এর মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে

যে সব খাবার প্রতিদিনের তালিকায় রাখতে হবে বা বাদ দিতে হবে তা জেনে নিন।

আঁশযুক্ত খাবার বেশি খাবেন

. সবুজ শাক-সবজি সালাদ

. ছোলা বুট

. টক ফল-খোসা সহ পেয়ারা, আমলকি, কামরাঙ্গা, আমরা, লেবু ও বরই চর্বি জাতীয় খাবার কম খাবেন

. উপকারী ফ্যাট বা অসম্পৃক্ত ফ্যাট জাতীয় খাবার খাওয়া ভালো

. সব রকমের মাছ

. উদ্ভিজ্জ তেল-কর্ণওয়েল, সানফ্লাওয়ার ওয়েল, সয়াবিন তেল (ক্যালরি অনুযায়ী)

যে সব খাবার পরিমিত পরিমানে খাবেন

. শর্করা জাতীয় খাবার

. দুধ বা দুধের তৈরি খাবার (সর ছাড়া দুধ)

. চিনি-মিষ্টি জাতীয় খাবার যতটা সম্ভব কম

প্রতিদিনের খাদ্যতালিকা থেকে যে খাবারগুলো বাদ দিতে হবে

খাসির মাংস, মাংসের চর্বি, গরুর মাংস, মগজ, কলিজা গলদা চিংড়ি, মাছের ডিম. ডিমের কুসুম (ডিমের সাদা অংশ খাওয়া যাবে) হাঁস ও মুরগি চামড়া, হাড়ের মজ্জা , ঘি, মাখন, ডালডা, নারকেল।

খাবার প্রস্তুত প্রনালীর সাথে ক্যালরি হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, যা ওজন কমাতে বা বাড়াতে সাহায্য করে। বিষয়টির সঙ্গে হৃদরোগের সম্পর্ক নিবিড়। রান্নার ক্ষেত্রে নিচের নিয়মাবলী মেনে চলুন-

১) খাবার ডুবো তেলে ভাজা যাবে না

২) ভাজার চেয়ে গ্রিল করা খাবার ভালো

৩) বেশি মসলা ও ভাজা খাবার রান্না করা উচিত নয়

৪) খাবার ভালো রান্না বা কম তেলে রান্না করা ভালো

বিশেষ পরামর্শ

প্রয়োজনের তুলনায় শরীরের ওজন বেশি হলে হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই নিচের টিপসগুলো মেনে চলুন-

. সুযোগ পেলেই হাঁটুন

. ধূমপানের অভ্যাস থাকলে ছেড়ে দিন

. মদ্যপান থেকে বিরত থাকুন

. টেস্টিং সল্ট অথবা লবন খাবেন না

. ডায়াবেটিস থাকলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখুন

. খাবারে কাঁচা লবন খাবেন না

হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে হলে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন অনিবার্য। প্রতিদিন নিয়মমাফিক সুষম খাবার গ্রহন করুন। হৃদরোগের ঝুঁকি থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হলে আপনাকে অবশ্যই পুষ্টি সচেতন হতে হবে।

ডাঃ এস.এম আহসান হাবীব
সহযোগী অধ্যাপক
কার্ডিওলজি বিভাগ, ইউনিভার্সিটি কার্ডিয়াক সেন্টার
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সুস্থতা

রোগজীবাণুর সাথে লড়াই করে সুস্থ থাকার জন্য শরীরে পর্যাপ্ত রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা থাকা আবশ্যক । বর্তমান সময়ে করোনা প্রতিরোধে শারীরিক রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার উন্নয়নেই মানুষের মনোযোগ বেড়েছে। কারন এটা সর্বজন স্বীকৃত যে যার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যত বেশী সে ততবেশী রোগজীবাণুর আক্রমণ হতে নিরাপদ থাকতে পারে। শিশুবয়স হতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উন্নয়নে মনোযোগী হওয়া উচিত। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য খাদ্যাভ্যাস গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষ কীভাবে সুস্থ থাকতে পারে এবং কোন উপায়ে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে, সেটি নিয়ে নানামুখী গবেষণা হয়েছে বিশ্বজুড়ে। চিকিৎসক এবং পুষ্টিবিজ্ঞানীরা বলছেন, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী না হলে অল্প অসুস্থতাতেও মানুষ খুব সহজে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং রোগের আক্রমণও জোরালো হয়। দিন দিন মহামারি করোনার প্রাদুর্ভাব ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। প্রতিদিনই এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা এবং মৃতের সংখ্যা বেড়ে চলছে। আমাদের দেশের পরিস্থিতিও এর ব্যতিক্রম নয়। শীতে এর প্রকোপ বাড়ার প্রবনতা নিয়ে উদ্বিগ্ন সবাই। এ অবস্থায় আমাদের উচিত প্রতিরোধের দিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া এবং এ জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো।

দু'ভাবে আমরা রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারি ১) ভিটামিন এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট যুক্ত খাবার এবং নিয়মিত খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে এবং ২) নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম এবং সুশৃংখল জীবনযাপনের মাধ্যমে

১.ভিটামিন এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট যুক্ত খাবার এবং নিয়মিত খাদ্যাভ্যাস মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নির্ভর করে ভিটামিন এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট-এর উপর। ভিটামিনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ন ভিটামিন হলো ভিটামিন 'ডি', 'বি' ও 'সি'। কোন কোন খাবারে এই ভিটামিন গুলো পাওয়া যায় জেনে নেয়া যাক। তার আগে প্রয়োজন সঠিক সময়ে সঠিকভাবে খাদ্য গ্রহনের অভ্যাস-

খাদ্যাভ্যাস: সারাদিনের খাবারের সময়টা নির্ধারিত থাকাটা ভালো এতে শরীরের উপকার হয়। সকালের নাস্তা যদি আমরা ১০টা ১১ টায় গ্রহন করি তবে আমাদের পাকস্থলী ১২ ঘন্টারও অধিক সময় ধরে খালি থাকে যা

শরীরের জন্য খুবই খারাপ। এছাড়া সকালে দেরীতে ঘুম হতে উঠা একটি বদঅভ্যাস। তাই সঠিক সময়ে (৬টার মধ্যে সর্বোচ্চ ৭টা)। দুপরের খাবার ২টার মধ্যে রাতের

খাবার ৮ টার মধ্যে। শোবার আগে একগ্লাস দূধ। এই নিয়মগুলো পালন করলে আমরা ভালো থাকবো । খাবার গ্রহনে প্রচুর শাকসবজি ও ফলমূলের গুরুত্ব দিতে হবে। ফলের রসের পরিবর্তে গোটা ফল চিবিয়ে খেলে ভালো। এতে পুষ্টি সাথে ফাইবারও পাওয়া যাবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করুন, ৮ থেকে ১০ গ্লাস। ফাস্টফুড, তেল-চর্বি ও মসলা জাতীয় খাবার যতটুকু সম্ভব পরিহার করুন।

দুগ্ধজাত খাবারঃ

দুগ্ধজাত খাবারগুলো বিজ্ঞানের ভাষায় প্রোবায়েটিকস হিসেবে পরিচিত। যেমন- দই, ঘোল, ছানা ইত্যাদি।

মানুষের পাকস্থলিতে যে আবরণ আছে, সেটার ভেতরে বেশ কিছু উপকারী জীবাণু কার্যকরী হয়। দুগ্ধজাত খাবারগুলোর পাকস্থলীতে উপকারী জীবাণুকে বাঁচিয়ে রাখে। ভিটামিন ডি এর জন্য দিনের কিছুটা সময় শরীরে রোদ লাগাতে হবে। এটা খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনাচরণের সাথে সম্পৃক্ত।

ভিটামিন 'বি' ও 'সি' জাতীয় খাবারঃ

এই ভিটামিনগুলো পানির সাথে মিশে যায়। এগুলো শরীরে জমা হয়না। এই ভিটামিনগুলো পানিতে মিশে যাওয়ার কারণে প্রস্রাবের সাথে বেরিয়ে যায়। শরীরের নার্ভ-এর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই দুই ধরণের ভিটামিন কাজ করে। শরীরের ভেতরে বিক্রিয়ার কারণে যেসব সেল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সেগুলো সারিয়ে তুলতে কাজ করে ভিটামিন সি। দুধ এবং কলিজার মধ্যে ভিটামিন বি আছে। টক জাতীয় যে কোন ধরণের ফল- লেবু, আমলকী, কমলা, বাতাবিলেবু এবং পেয়ারাতে ভিটামিন সি আছে। এ ছাড়াও বাজারে ট্যাবলেট আকারে পাওয়া যায়, যা ফ্লু উপসর্গে আপনি দিনে ১-২ বার চুষে খেতে পারেন। তবে প্রাকৃতিক উৎস থেকে পাওয়া ভিটামিন সি-এর কার্যকারিতা বেশি।

ভিটামিন ডিঃ এর প্রাকৃতিক উৎস হচ্ছে সূর্যরশ্মি। নিয়ম করে রোজ একটু রোদে থাকলে বিশেষ করে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত শরীরের কিছু অংশ উন্মুক্ত করে (যেমন মুখমন্ডল, হাত বা ঘাড় ইত্যাদি) রোদ পোহালে উপকার পাওয়া যাবে। শীতের এ রোদটা বেশ নরম ও আরামদায়ক তাই বর্তমান সময়ের এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় ভিটামিন গ্রহন করা যায়। এ ছাড়াও ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার যেমন- ডিমের কুসুম, মাছের তেল, ওমেগা, গরুর কলিজা, চিজ এগুলো খেতে পারেন। যদি সম্ভব হয় বিশেষ করে যাদের বয়স ৩০ এর উপরে তারা শরীরে ভিটামিন ডি এর লেভেলটা পরীক্ষা করে নিতে পারেন বিশেষ করে করোনার এই সময়টায় যেখানে শরীরে ভিটামিন ডি ভীষন রকমে প্রয়োজন। শরীরে পর্যাপ্ত পরিমানে ভিটামিন ডি না থাকলে প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ভিটামিন ডি ট্যাবলেট গ্রহন করুন।

জিংকঃ ফ্লু বা সর্দি-কাশি উপসর্গে জিংকের বেশ উপকারিতা রয়েছে। জিংক-সমৃদ্ধ খাবারগুলো হচ্ছে আদা, রসুন, ডাল, বিন্স, বাদাম, সামুদ্রিক মাছ ইদ্যাদি। বাজারে লজেন্স আকারে জিংক সাপ্লিমেন্ট খেতে পারেন ২-৩ ঘণ্টা পর পর।

মধুঃ মধুতে এমন কিছু জীবাণু ধ্বংসকারী উপাদান রয়েছে, যেমন হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড)। তাই ফ্লু উপসর্গে মধু বেশ উপকারী। তবে ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে সাবধানে খেতে হবে।

নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম এবং সুশৃংখল জীবনযাপনঃ যেকোন ভালো অভ্যাস দীর্ঘ পরিচর্চায় ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনে। আমরা সব না পারি কিছু কিছু ভালো অভ্যাস তৈরী করতে পারি যা আমারদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবার পাশাপাশি আমাদেরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে ভালো থাকতে সাহায্য করবে। এসব অভ্যাসের মধ্যে

সর্বপ্রথম যেটা আলোচনায় আসা উচিত সেটা হলো নিয়মিত ব্যায়াম অথবা শারীরিক পরিশ্রম নিয়মিত ব্যায়াম অথবা অন্য যে কোন ধরণের শারীরিক পরিশ্রম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে শারীরিক

পরিশ্রমের সম্পর্ক আছে। একজন মানুষ যখন শারীরিক পরিশ্রম করে তখন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করে। শরীরের মাংসপেশি এবং হৃদযন্ত্র অনেক কার্যকরী হয়। একই সাথে শরীরের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়। ফলে শরীরের দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত অক্সিজেন পৌঁছুবে। তখন শরীরের কোষগুলোতে শক্তি উৎপাদন শুরু হবে। শরীরকে সুস্থ রাখতে এবং রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে শরীরচর্চা অপরিহার্য। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন আমরা সবাই ঘরে অবস্থান করছি। প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট এবং বাচ্চাদের অন্তত ১ ঘণ্টা শরীরচর্চা করা উচিত। ঘরে থেকে আপনি যা করতে পারেন হাঁটাহাটি, সাইক্লিং, ইয়োগা, ওয়েট শিফটিং, সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা, এমনকি নফল নামাজ পরাও আপনার শরীর চর্চার উপায় হতে পারে।

মানসিক চাপমুক্ত থাকুন: অতিরিক্ত মানসিক চাপে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে ফেলে। তাই মানসিক চাপমুক্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে। টিভি, সোশ্যাল মিডিয়ায় যে খবরগুলো আপনাকে মানসিক চাপে ফেলছে, সেগুলো থেকে দূরে থাকুন। পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে ভালো সময় কাটান, গান শুনুন, বই পড়ুন, মুভি দেখুন বা নতুন কিছু শিখতে মনোনিবেশ করুন। মেডিটেশন একটি খুব ভালো উপায় মনকে শান্ত রাখার।

ধূমপান ও মদ্যপান পরিহার করা: বিশেষ করে ধূমপান, সরাসরি আপনার শ্বাসতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যেহেতু করোনা ভাইরাস শ্বাসতন্ত্রের রোগ, এতে সংক্রমের আশঙ্কা বেড়ে যায়। তাই ধূমপান বাদ দিন।

পর্যাপ্ত বিশ্রাম এবং ঘুম: অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। প্রতিদিন অন্তত ৮ ঘণ্টা করে ঘুমানোর চেষ্টা করুন। পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশ্রাম আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে খুবই জরুরি।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা: আমরা যদি করোনা ভাইরাস রোগের সংক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাতে চাই নিজের ও আশপাশের পরিবেশের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা

অত্যন্ত জরুরি। নির্দিষ্ট সময় পর পর হাত সাবান-পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ব্যবহার্য জিনিপত্র জীবাণুনাশক পদার্থ দিয়ে পরিষ্কার করে নিন। দরজার হাতল, সুইচ, লিফটের বাটন জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার রাখুন ও মাস্ক ব্যবহার করুন।

সুস্থতা একটা বড় প্রাপ্তি। প্রয়োজনীয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা না থাকলে আমাদের শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ থাকাটা জটিল হয়ে যাবে। তাই রোগজীবাণুর সাথে লড়াই করে বেচেঁ থাকার জন্য আমাদেরকে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোতে মনোযোগী হতে হবে। যা কেবল সঠিক খাদ্যাভাস, সুষম খাবার গ্রহন , নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম এবং মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়ার মাধ্যমেই সম্ভব।

নাজনীন নাহার

শীতে শিশুর যত্ন নিতে

ভোরের ঘাসের ডগায় শিশির জমতে শুরু করেছে ভালোবেসে মানে গুটি গুটি পায়ে চলে এলো শীত। ঘরের আলমারীর ভারীকাপড় রাখার তাকে হাত পড়লো বলে। শীতের বস্ত্রগুলো আহলাদিত হচেছ আপনার হাতের ছোঁয়া পাবে বলে বহুদিনের পর। অন্যদিকে রোগবালাইরাও প্রস্তুতি নিচ্ছে আপনাকে আক্রমন করার এবার তো পোয়াবারো, সাথে আছেন করোনা । তাই এবারের শীতের প্রস্তুতিটাও নিতে হবে ভিন্নভাবে। খাবারের তালিকায় ভিটামিন সি এবং ডি , শাকসবজি ফলমূলের সংযোজন যেমন বাড়াতে হবে তেমনি উষ্ণতার জন্য নরম এবং গরম কাপড় ত্বকের যত্ন সহ বিভিন্ন বিষয়গুলোকে গুরত্বদিয়েই শীতের প্রস্তুতিটা সারতে হবে। জেনে নিতে হতে সম্ভাব্য অসুখ বিসুখের কথা এবং এর থেকে বাঁচার উপায় এবং সচেতনতা। বিশেষ করে ঘরের বয়োজেষ্ঠ আর শিশুদের জন্য। কেননা শীতের কনকনে বাতাস শিশু বুড়ো দুইয়ের জন্যই বয়ে আনতে পারে সর্দি ও ঠান্ডার সংক্রমণ আর শিশুদের শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এখনো পুরোপুরি বিকাশ লাভ করেনি, অপরদিকে বয়স্কদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা সাধারণত এই বয়সে একটু কমই থাকে বিশেষ করে আমাদের দেশে। তবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আপনি নিজের সোনামনিকে উষ্ণ এবং সুরক্ষিত রাখতে পারেন।

শীতকালে শিশুর যত্ন নেওয়া কেন দরকার

শীতের সময় পরিবেশের তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ার কারনে তা শিশুর শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলি ভালভাবে কাজ করা ব্যহত হয়। তারপরে বেশিরভাগ এনার্জি শরীরের তাপমাত্রা যথাযথভাবে বজায় রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়, অন্য কাজ থেকে সরিয়ে দেয়। এই সময়ই শরীরের অনাক্রম্যতা অত্যাধিক লাগে। শীতের সময়, জীবাণু ও ভাইরাসগুলি ছড়িয়ে পড়ে এবং সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকার কারনে শিশুরা রোগজীবানু দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

শীতকালে ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট সমস্যাগুলি

শীতকালে সাধারনত ভাইরাসজনিত সমস্যাই বেশী হয়ে এবং তা একের থেকে অন্যের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। এবার আবার যুক্ত হয়েছে করোনা ভাইরাস , যা হাচি, কাশি ও পারস্পারিক স্পর্শের মাধ্যমেও ছড়ায় এই ভাইরাস । শীতকালীন সাধারণ যে রোগগুলি হয়

. ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং ব্রঙ্কিওলাইটিস

. ক্রোপ, পাশাপাশি রাইনোভাইরাস

. শ্বাস প্রশ্বাসের সংবেদনশীল বিভিন্ন ভাইরাস, যা শ্বাসযন্ত্রের ট্র্যাক্টকে প্রভাবিত করে এবং কাশি ও শ্বাসকষ্টের গুরুতর সমস্যা তৈরি করে।

. করোনা

শিশুদের মধ্যে শীতের বিভিন্ন সংক্রমণের লক্ষণ

শীতকালে যে সংক্রমণগুলো ঘটে তার বেশিরভাগেরই দৃঢ় লক্ষণ থাকে যার ফলে রোগ সহজেই অনুমান করা যায়। শিশুর সংক্রমনের সাধারন লক্ষনগুলো নিম্নরুপঃ

. নাক দিয়ে পানি পড়া

. হালকা গা গরম এবং কাশি

. খাবারে অরুচি

. অহেতুক কান্নাকাটি এবং দূর্বলতা

অসুস্থ হয়ে পড়লে যে উপসর্গ হলে দ্রুত ডাক্তারের কাছে যাবেন

. মারাত্মকভাবে কাশি এবং বমিও

. শ্বাস নিতে সমস্যা হলে বা সে হাঁপিয়ে গেলে বা ছোট ছোট ও ঘন ঘন শ্বাস নিলে

. ঘুমানোর সময় বা কাশি হওয়ার পরেও শ্বাস নেওয়ার শব্দ হতে পারে

. শ্বাসকষ্টের সংক্রমণের ফলে ফুলে যাওয়া ফুসফুসের কারণে তার বুকে ব্যথা হতে পারে

. তার মাথা ব্যথার সাথে নাক দিয়ে সর্দি ঝরা, জ্বর, কাশি হতে পারে

. সে ক্লান্তি বোধ করতে পারে।

শীতের সময় আপনার শিশুর যত্ন নেওয়ার দরকারী টিপস

শীতের মৌসুমে আপনি কিভাবে শিশুর ত্বক ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে পারেন এবং নিশ্চিত হন যে সে পুরো মৌসুমে সুস্থ আছেন, তার জন্য কিছু টিপস দেওয়া হল।

১. স্বাভাবিকভাবে শিশুর শোবার ঘরটি উষ্ণ রাখার ব্যবস্থা প্রয়োজনে রুম হিটার

সকালে রোদ উঠলে ঘরের দরজা জানালা খুলে দেবেন যাতে ঘরে রোদ প্রবেশ করে। রুম পরিস্কার পরিছন্ন রাখবেন। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঠেলে পড়লে বা শেষ বিকেলে জানালাটা আগে আগে বন্ধ করে দেবেন এতে সন্ধ্যার ঠান্ডা বাতাস ঘরে প্রবেশ করবে না। শীত বেশী পড়লে ঘরের তাপমাত্রা হ্রাস পাবে, সুতরাং আপনার শিশুর ঘরে হিটিং সিস্টেম বা পোর্টেবল হিটার ব্যবহার করা যেতে পারে। ৩০০০ হতে ৩৫০০ এর মধ্যে ছোট রুম হিটার বাজারে পাওয়া যায়। এর ব্যবহারে আর্দ্রতার স্তরটি সর্বোত্তমভাবে বজায় থাকে।

২. ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন

আপনার ছোট্টটির ত্বক অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং শীতের কঠোর পরিবেশ এটিকে শুষ্ক করে তুলতে পারে। আপনি যদি নিজের ছোট্টটির ত্বককে নরম এবং কোমল

রাখতে চান তবে তার ত্বকে একটি ভাল ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। শিশুর ত্বকের জন্য তৈরি ত্বকের ক্রিম বা ময়েশ্চারাইজারটি বেছে নিন। আপনি দুধের ক্রিম

এবং মাখন সমৃদ্ধ একটি ক্রিম বা লোশন ব্যবহার করতে পারেন, এটি আপনার শিশুর ত্বকের আভা ও গঠন বজায় রাখতে সহায়তা করবে।

৩. মাত্রাতিরিক্ত পণ্য ব্যবহার করবেন না

নতুন বাবা-মা হিসাবে, আপনি দোকানে আসা প্রতিটি নতুন এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শিশু যত্নের পণ্য কিনতে চাইবেন, তবে প্রলোভনে পা দেবেন না, কারণ আপনার শিশুর ত্বকে প্রচুর পণ্য ব্যবহার করা তার কোনো উপকারে আসবে না। লোশন এবং ক্রিম প্রয়োগ করা ভাল, তবে আপনি যদি প্রায়শই তাকে স্নান করান এবং তার উপর বেশ কয়েকটি পণ্য ব্যবহার করেন তবে এটি কেবল তার ত্বককে আরও শুষ্ক করবে। এছাড়াও, প্রতিদিন বা খুব ঘন ঘন সাবান এবং শ্যাম্পু ব্যবহার এড়িয়ে চলুন। এই পণ্যগুলি তার ত্বকের আর্দ্রতা ছিনিয়ে নেবে এবং এটিকে শুষ্ক করে তুলবে।

৪. আপনার শিশুর ত্বক হালকা করে ম্যাসাজ করুন

আপনার সন্তানের যথাযথ বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য প্রতিদিন তাকে ম্যাসাজ করা জরুরী। ম্যাসাজ করার কাজটি দেহের মধ্যে রক্ত প্রবাহকে উদ্দীপিত করে এবং সুস্থতার বোধকে বৃদ্ধি করে, যা পরোক্ষভাবে শিশুর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ম্যাসাজ করার জন্য ভাল ম্যাসাজের তেল ব্যবহার করুন (এক্ষেত্রে সরিষার তেল ব্যবহার করতে পারেন) এবং তাকে আলতোভাবে ম্যাসাজ করুন।

৫. শীতের কম্বল বা লেপ যেন ভারী না হয়

আপনার বাচ্চাকে উষ্ণ রাখার জন্য ভারী কম্বল রাখা শীতকালে আপনার ছোট্ট শিশুটিকে আরাম দেওয়ার সর্বোত্তম উপায় বলে মনে হতে পারে, তবে এটি তাকে উষ্ণ রাখার সবচেয়ে নিরাপদ উপায় নয়। আপনি যদি নিজের শিশুকে উষ্ণ রাখার জন্য ভারী কম্বল ব্যবহার করেন তবে সে তার হাত-পা অবাধে নাড়াচাড়া করতে পারবে না। এবং এটি করার চেষ্টা করার সময়, সে কম্বলটি নিজের মুখের উপরে টানতে পারে, যা এসআইডিএসের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলবে। তাই লেপ বা কম্বল হালকা হলে ভালো। বাজারে শিমুল তুলো দিয়ে অর্ডার দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন । লেপেই বেশী ভালো। কম্বলের পশম অনেক শিশুর এলার্জীর কারন হতে পারে।

৬. পরিধেয় কাপড় যেন আরামদায়ক হয়

আপনার শিশুকে সবসময় মোটা সোয়েটার, গ্লাভস, মোজা এবং একটি টুপি পরিয়ে রাখা তাকে সহজেই নড়াচড়া করতে বাধা দিতে পারে এবং তাকে বিরক্ত করে তুলতে পারে। তাই তাকে ঘরের তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে পোশাক পরান এবং এমন কাপড় বেছে নিন যা তার শরীরকে পুরোপুরি ঢেকে দেয় আপনি তাকে গ্লাভস এবং মোজাও পরাতে পারেন এগুলো শিশুর শরীর উষ্ণ রাখবে এবং রাত্রে তাকে শান্তিতে ঘুমাতে দেবে।

৭. আপনার শিশুর ঘরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করুন

আপনার বাড়ি ও আপনার শিশুর ঘরটি আরামদায়ক এবং উষ্ণ রাখা আপনার শিশুকে শীতের কঠোর বাতাস থেকে সুরক্ষিত রাখবে। আপনার বাড়ির জানালা বন্ধ রাখুন এবং দরজাগুলি ভালভাবে লক করুন। এটি বলা হচ্ছে, তবে আপনার শিশুর ঘর এবং গোটা বাড়ির বায়ু চলাচল থাকা নিশ্চিত করুন। প্রয়োজনে হিটার ব্যবহার করুন, যাতে আপনার শিশু নিজে থেকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

৮. ভ্যাকসিনেশন সময়সূচী মেনে চলুন

শীতের সময়, আপনার শিশু সংক্রমণের জন্য বেশি সংবেদনশীল হবে। তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কম হবে। তবে এটি আপনার শিশুকে অসুস্থ করে তুলতে

পারে এই আশঙ্কায় কোনো ভ্যাকসিন এড়িয়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। আপনার শিশুকে সঠিক সময়ে টিকা দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার শিশুকে টিকা দেওয়া ভবিষ্যতে তাকে সুস্থ রাখবে।

৯. আপনার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান

বুকের দুধে অ্যান্টিবডি এবং পুষ্টি থাকে যা শিশুর প্রতিরোধ ক্ষমতা জোরদার করতে এবং তাকে স্বাভাবিক রোগ থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করে। এমনকি যদি আপনি তাকে কঠিন খাবার খাওয়ানো শুরু করেন তবুও তাকে বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যান। বুকের দুধ তাকে সুস্থ থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পুষ্টি সরবরাহ করবে এবং বুকের দুধ খাওয়ানোর সময়, আপনার শরীরের উষ্ণতাও তাকে আরাম দেবে।

১০. নিজের স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখুন

আপনি আপনার সন্তানের জন্য যোগাযোগের প্রথম পয়েন্ট হতে চলেছেন। সুতরাং, আপনার পরিষ্কার এবং সুস্থ থাকা খুবই প্রয়োজনীয়। আপনি যখন আপনার সন্তানের কাছে যান, তখন প্রতিবার আপনার হাত ধুয়ে ফেলুন এবং একটি স্যানিটাইজার দিয়ে তাদের জীবাণুমুক্ত করুন। জীবাণুগুলি আপনার শিশুর কাছে পৌঁছানোর উপায় খুঁজে পেতে পারে, তাই নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি তাদের জন্য সমস্তপথ বন্ধ করে দিয়েছেন। আপনার শিশুর জন্য যদি অতিথি বা দর্শনার্থী থাকে তবে বিনীতভাবে তাদের শিশুর কাছে আসার আগে তাদের হাত ধুতে বা স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে বলুন।

১১. বাইরে যাওয়ার সময় যত্ন নিন

বাইরে একেবারে হিমশীতল না হলে কিছুটা তাজা বাতাস পেতে মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে বের হওয়া ভাল। তবে নিশ্চিত করুন যে আপনি যদি শিশুটিকে বাইরে নিয়ে যান তবে আপনার শিশুর মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে। শীতল বাতাসে ত্বকের যে কোনো এক্সপোজার তাকে দ্রুত অস্বস্তি বোধ করাতে পারে। আপনার শিশুর পায়ের আঙুলগুলি খানিকটা গরম এবং উষ্ণতর দিকে রয়েছে তা নিশ্চিত করুন। এটি আপনার শিশুর শরীর সঠিক তাপমাত্রায় থাকাই আদর্শ।

১২. আপনার শিশুর ডায়েটে স্যুপ অন্তর্ভূক্ত করুন

যদি আপনার শিশুটি এমন বয়সে পৌঁছে যায় যেখানে সে অল্প-কঠিন খাবার খেতে শুরু করে থাকে তবে শীতকালে তার ডায়েটে স্যুপের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত সময়। ঠান্ডা আবহাওয়ায় একটি স্বাস্থ্যকর স্যুপ তাকে উষ্ণ রাখবে। আপনি আপনার শিশুর জন্য স্যুপ

তৈরি করতে পারেন এবং এতে ম্যাস করা (বা পিউরি) মুরগির মাংসের টুকরো বা শাকসবজি যুক্ত করতে পারেন। এছাড়াও, স্যুপে রসুন চূর্ণ অন্তর্ভুক্ত করুন, এটি শীতের সময় আপনার শিশুকে উষ্ণ রাখে এবং শীতের বিভিন্ন অসুস্থতা থেকে তাকে রক্ষা করে।

শীতের নরম রোদ শিশুদের জন্য ভালো তাই তাও উপভোগ করতে হবে শুধু সাথে কিছু সাবধানতা। শিশুর প্রতি যত্নশীল হলে শীতে আপনার অকারন টেনশন অনেকটাই কমে যাবে। কেননা তার সুস্থতা মানেই, কিন্তু আমাদের সুস্থতা সুতরাং প্রস্তুতি শুরু ে হ া ক ঘরের ছোট সদস্যের জন্য যে আমাদের আগামী।

পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমঃ আর নয় অবহেলা

কেস স্টাডি ১: ২৫ বছর বয়সী মানসীর (কাল্পনিক) বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই মাসিক অনিয়মিত। ৬ মাস পর পর একবার মাসিক হয় তার। মাসিকের সময় প্রচুর রক্তপাতের সাথে থাকে প্রচন্ড পেটে ব্যাথা। ছোট বেলা থেকেই তার ওজন বয়স এবং উচ্চতার তুলনায় অনেক বেশি। তার মুখে পুরুষের মত লোম আছে যা তার মায়েরও আছে। সে কয়েক বার গর্ভধারনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে।

কেস স্টাডি ২: ৩০ বছর বয়সী স্বর্নার (কাল্পনিক) বিগত ৬ মাস ধরে মাসিক হয় না। সে গত ১ বছর থেকে গর্ভধারনের চেষ্টা করে যাচ্ছে। গত কয়েক মাসে তার ওজন বেশ কয়েক কেজি বেড়ে গেছে। সে নিশ্চিত ছিল সে গর্ভবতী কিন্তু প্রেগন্যান্সি সংক্রান্ত সব রিপোর্টই নেগেটিভ এসেছে। সে ২৪ বছর বয়স থেকেই দুশ্চিন্তা ও অনিদ্রায় ভুগছে। তার মায়ের উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস আছে।

উপরে আলোচিত দুইটি কেসই পলিসিস্টিক ওভারির খুব প্রলিত উপস্থাপনা। পলিসিস্টিক ওভারি যেটাকে মেডিকেলের ভাষায় বলে Polycystic Ovarian Syndrome বা PCOS. ১৯৩৫ সালে আরউইং স্টেইন এবং মাইকেল লেভেন্থাল নামক দুই ভদ্রলোক সর্বপ্রথম এই রোগের বিস্তারিত বর্ণনা দেন। সুদীর্ঘ ৫০ বছর যাবত রোগটি স্টেইন লেভেন্থাল সিনড্রোম নামে পরিচিত ছিল যার বর্তমান নাম পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম। যে বয়সের নারীরা গর্ভধারনে সক্ষম (১৫-৪৫ বছর বয়সী) তাদের ৪-১০% ই এই রোগের ভুক্তভোগী। রোগটি আজীবন থাকে এবং খুব অল্প বয়সেই রোগটির উপসর্গ প্রকাশ পায়। ১৯৩৫ সালে রোগটি সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করা গেলেও আজ পর্যন্ত রোগটির সঠিক কারন জানা যায়নি।

রোগটির কারণে প্রতি বছরই অনেক অর্থ ব্যয় হয়। এক গবেষনায় দেখা গেছে পলিসিস্টিক ওভারিতে আক্রান্ত রোগীদের হাসপাতালে ভর্তির হার সাধারন রোগীদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুন। রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে রোগটির নিয়মিত পর্যবেক্ষন খুবই জরুরী। এর জন্য আগে জানতে হবে কোন কোন উপসর্গ দেখা দিলে রোগটি হয়েছে বলে সন্দেহ করা যায় এবং রোগটির দীর্ঘমেয়াদী জটিলতা কিভাবে এড়ানো সম্ভব।

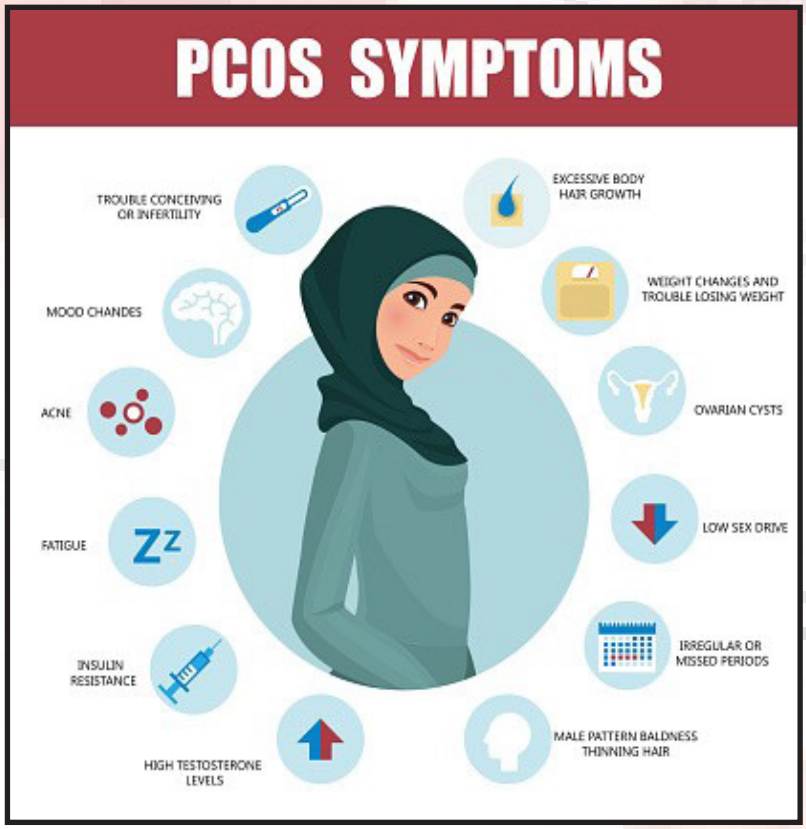

পলিসিস্টিক ওভারিঃ কেন হয়

পলিসিস্টিক ওভারির সুনির্দিষ্ট কারন যদিও এখনও অজানা তবুও কিছু গবেষনালব্ধ তাত্ত্বিক ধারনা রয়েছে। সাধারনত ওভারি যখন স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে না তখন এর ফলিকল গুলো বিভিন্ন ধাপে তাদের বৃদ্ধি বন্ধ করে দেয় যার কারণে মনে হয় ওভারির উপরিভাগে অনেকগুলো সিস্ট তৈরী হয়েছে। এটি হরমোনাল ব্যালেন্স নষ্ট হওয়ার কারণে হতে পারে। আবার অনেক সময় আমাদের ইনসুলিন সংশ্লিষ্ট জিনে মিউটেশন জনিত পরিবর্তনের কারনেও পলিসিস্টিক ওভারি হতে পারে।

এক গবেষনায় দেখা গেছে যেসব বাচ্চা কম ওজন নিয়ে জন্ম নেয় তাদের পরবর্তীতে পলিসিস্টিক ওভারি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া অনেক সময় বংশগত বা পরিবেশগত কারনেও রোগটি হতে পারে।

পলিসিস্টিক ওভারিঃ কিভাবে বুঝবেন

পলিসিস্টিক ওভারি শনাক্ত করার জন্য বেশ কয়েকটি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হল Rotterdam Criteria. নিম্নের ৩ টির যে কোন দুইটি থাকলেই পলিসিস্টিক ওভারি আছে বলে ধরে নেয়া হয়-

১) এন্ড্রোজেন বা পুরুষ হরমোনের আধিক্য
২) অনিয়মিত মাসিক
৩) আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষায় যে কোন একটি ওভারিতে ১২ বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক সিস্টের উপস্থিতি।

কম বয়সের নারীরা মূলত প্রজনন জনিত বা মানসিক সমস্যা নিয়ে আসে এবং একটু বেশি বয়সের নারীরা বিপাকীয় সমস্যা নিয়ে চিকিৎসকের কাছে আসেন। অনেক সময় কোন উপসর্গ নাও থাকতে পারে। নিম্নলিখিত উপসর্গগুলো সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নারীতে পাওয়া যায়।

১. অনিয়মিত মাসিকঃ
সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নারীর অভিযোগ থাকে যে, মাসিক ঠিকমত হচ্ছে না বা একদমই হচ্ছে না। মাসিকের রক্তপাত স্বাভাবিকের তুলনায় কম বা বেশি থাকতে পারে।

২. স্থূলতাঃ
পলিসিস্টিক ওভারিতে ভোগা নারীদের ৫০-৮৫% ই স্থূলতার সমস্যায় ভুগেন। যদিও এই স্থূলতা পরিবেশ, জীবনযাপন পদ্ধতি, পারিবারিক ইতিহাসের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। স্থূলতায় ভোগা পলিসিস্টিক

ওভারির নারীদের পরবর্তী জীবনে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। এছাড়াও এদের ভালো লিপিড (HDL) কমে যায় এবং ক্ষতিকর লিপিড (LDL) বেড়ে যায়।

৩. অতিরিক্ত লোমঃ

এই রোগের নারীদের শরীরের অবাঞ্ছিত স্থানে অতিরিক্ত লোম দেখা যায়। এর সাথে ব্রনের সমস্যাও দেখা দেয়।

৪. টাইপ-২ ডায়াবেটিসঃ

পলিসিস্টিক ওভারিতে আক্রান্ত নারীদের প্রতি ৫ জন নারীর ১ জনের টাইপ-২ ডায়াবেটিস ও গর্ভকালীন সময়ে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যাদের পরিবারের কোন সদস্যের ডায়াবেটিস আছে, তাদের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা আরো বেশি।

৫. বন্ধ্যাত্বঃ

পলিসিস্টিক ওভারিতে আক্রান্ত নারীদের স্বাভাবিক নারীদের তুলনায় প্রায় ১০ গুন বেশি বন্ধ্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শুধু তাই নয় এই রোগে আক্রান্ত নারীদের গর্ভপাত বা ওজনে কম বাচ্চা জন্ম দেওয়ার সম্ভাবনাও স্বাভাবিক নারীদের তুলনায় অনেক বেশি।

৬. ক্যান্সারঃ

দেখা গেছে জরায়ু ক্যান্সার (এন্ড্রোমেট্রিয়াল ক্যান্সার) হওয়ার সম্ভাবনা পলিসিস্টিক ওভারির নারীদের ক্ষেত্রে প্রায় ৩ গুন বেশি। তবে আশার কথা হল, এই ক্যান্সার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভালো হয়ে যায়। তবে কোন অস্বাভাবিক রক্তপাত হলে তা অবশ্যই সাথে সাথে চিকিৎসককে জানাতে হবে।

৭. মানসিক স্বাস্থ্যঃ

পলিসিস্টিক ওভারিতে আক্রান্ত নারীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিষন্নতা, দুশ্চিন্তা, আস্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাস, যৌন সমস্যায় ভুগে। এসব সমস্যার প্রতি অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে।

পলিসিস্টিক ওভারিঃ চিকিৎসা কি

পলিসিস্টিক ওভারির আজ পর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি। মূলত উপসর্গভিত্তিক চিকিৎসা সেবাই প্রদান করা হয়। সাধারনত নিম্নলিখিত ধাপসমূহে চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে।

১. জীবনযাপন পদ্ধতির পরিবর্তনঃ

দেখা গেছে স্থুলতা এই রোগের জটিলতা বাড়িয়ে তোলে। তাই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। যদিও কোন সুনির্দিষ্ট খাদ্যাভ্যাস বা ব্যায়ামের কথা বলা হয়নি, তবুও এ দুটি উপাদানই এ রোগের চিকিৎসায় অন্যতম প্রধান নিয়ামক। এক ট্রায়ালে দেখা গেছে, মাত্র ৫% ওজন কমালেই তা মাসিক নিয়মিত করতে, প্রজনন ক্ষমতা বাড়াতে, ব্রন কমাতে এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে সাহায্য করে।

২. ঔষধঃ

যখন দেখা যাবে যে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন এবং নিয়মিত ব্যায়ামের পরও উপসর্গ কমছে না তখন ঔষধ সেবন করতে হবে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের শরনাপন্ন হতে হবে।

৩. নিয়মিত স্ক্রিনিং:

চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত স্ক্রিনিং করতে হবে। বিশেষত রক্তচাপ, Lipid profile, ওজন, ওজন ও উচ্চতার অনুপাত এগুলো নিয়মিত পর্যবেক্ষন করতে হবে। ওজন ও উচ্চতার অনুপাত স্বাভাবিক থাকলে রক্তচাপ বছরে একবার মাপলেই হয় আর অস্বাভাবিক থাকলে প্রতিবার চিকিৎসকের শরনাপন্ন হওয়ার সময় মেপে নিতে হয়। এছাড়া Lipid profile প্রতি ২ বছরে একবার মাপতে হবে। তবে অস্বাভাবিক থাকলে প্রতি বছর ১ বার করে মাপতে হবে।

পলিসিস্টিক ওভারি পুরোপুরি নিরাময় হওয়া সম্ভব নয়। তবে সচেতন হলে এই রোগের জটিলতা থেকে বাঁচা সম্ভব। মনে রাখতে হবে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নিলে নিজেকে সুস্থ রাখা সম্ভব। নিজের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। ছোটোখাটো উপসর্গ গুলোকে অবহেলা না করে সেগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। আপনার শরীর ততক্ষনই ভালো থাকবে যতক্ষন আপনি তার যত্ন নিবেন। বেশি করে জানুন, ভালো থাকুন।

ডাঃ শায়লা আজিজ

শীতে ত্বকের যত্ন নিন ঘরোয়া উপায়ে

গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে আসছে শীত। আর সবার আগে শীতের আগমন জানান দেয় আপনার ত্বক। এর শুষ্কতার জন্য এসময় প্রয়োজন বাড়তি যত্ন। করোনার এই সময়ে বাইরে বেরুনো একটা কঠিন সেই সাথে পার্লারে যাওয়াটাও ঝুকিঁপূর্ন তাই এবারের শীতে ত্বকের যত্নে ঘরোয়া পদ্বতিগুলোই হয়ে উঠতে পারে সমাধান। মনে রাখতে হবে শীতের প্রকোপে ত্বক ক্রমশ আর্দ্রতা হারাবে, তাই বিশেষ যত্নআত্তি না পেলেই ত্বক নষ্ট হতে পারে বিভিন্নভাবে এছাড়াও বড়দের ক্ষেত্রে দেখা দেবে বলিরেখা। বয়সের আগেই ত্বকে ভাঁজ পড়বে, তা কুঁচকে যেতেও পারে। আশার কথা হচ্ছে, সামান্য একটু সচেতন হলেই কিন্তু এই সমস্যার হাত থেকে নিজেকে বাঁচানো সম্ভব।

শুষ্ক ত্বকের হাত থেকে বাঁচতে পর্যাপ্ত পানি পান জরুরী:

শীত এলে সাধারনত পানি খাওয়া কমে যায় অনেকের। আমরা হয়তো জানিনা শরীর ভিতর থেকে আর্দ্র না হলে তার ছাপ পড়বে ত্বকের উপর। এছাড়াও শরীরে পানির অভাবে অনেক সমস্যাই তৈরী হতে পারে। তাই পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করুন। দিনে অন্তত পক্ষে আট-দশ গ্লাস জলপান করা একান্ত আবশ্যক। ডাবের পানি, ফলের রসও পান করতে পারেন।

অলিভ অয়েলঃ

অলিভ অয়েল সাধারণত সব ধরনের ত্বকের পক্ষেই খুব কার্যকর। এর মধ্যে উপস্থিত ফ্যাটি অ্যাসিড ও অ্যান্টিঅক্সিডান্ট শুধু আপনার মুখ নয়, পুরো শরীরের ত্বকের যত্ন নেয়। গোসলের আধ ঘণ্টা আগে মুখে ও পুরো শরীরে অলিভ অয়েল মেখে নিন। তার পর হালকা গরমজলে স্নান সেরে লাগিয়ে নিন ময়েশ্চরাইজার। অলিভ অয়েল, ব্রাউন সুগার, আর মধু এমন অনুপাতে মিশিয়ে নিন যেন ঘন ক্রিমের মতো একটি উপাদান তৈরি হয়, তারপর হালকা হাতে সর্বাঙ্গে মেখে নিন এই মিশ্রণটি। অল্প চাপ দিয়ে গোল গোল করে মালিশ করুন, এতে আপনার শরীরের সমস্ত মৃত কোষ উঠে যাবে। তার পর স্নান করে হালকা ময়েশ্চরাইজার লাগিয়ে নিন।

দুধ/ দইঃ

রুক্ষ, শুষ্ক, ফাটা ত্বকে অনেক সময়েই জ্বালা বা চুলকানির মতো সমস্যাও দেখা যায়। তেমন হলে এক লিটার ঠান্ডা দই বা দুধে নরম কাপড় বা তুলো ভিজিয়ে নিন সর্বাঙ্গে লাগান। অন্তত পাঁচ মিনিট এই প্রলেপটি ব্যবহার করুন। তাতে ত্বকের জ্বালাভাব দূর হবে। দই বা দুধে উপস্থিত ল্যাকটিক অ্যাসিডের প্রভাবে ঝলমলিয়ে উঠবে আপনার ত্বক। কাঁচা দুধের সঙ্গে মধু মিশিয়ে নিন। তার পর সেটি আপনার গোটা শরীরে লাগিয়ে নিন গোসলের আগে। দই দিয়েও এই প্রলেপটি তৈরি করা যায়। প্রলেপটি শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন ও স্নান করে নিন।

অ্যালোভেরাঃ

অ্যালোভেরা এমনই একটি উদ্ভিদ, যা টবে লাগালে খুব সহজেই বেড়ে ওঠে। একটি অ্যালোভেরা পাতা নিন, মাঝখান থেকে কেটে ফেলুন সেটিকে। শাঁসটা বের করে নিয়ে ত্বকে লাগিয়ে নিন। জ্বালাভাব, চুলকানি মুহূর্তে কমে যাবে। সেরে যায় ছোটখাটো ইনফেকশনও। আর্দ্রতা জোগানোর পাশাপাশি এই শাঁস বা জেলের পরত আপনার ত্বকের উপর তৈরি করে রাখে সুরক্ষার আবরণ, তাতে দূষণ আপনার ত্বকে কোনও ছাপ ফেলতে পারে না।

নারকেল তেলঃ

মুখ ও শরীরের ত্বকের পাশাপাশি গোড়ালি, হাঁটু, কনুইয়ের ও বিশেষ খেয়াল রাখা প্রয়োজন, বিশেষ করে শীতকালে। না হলে এগুলি রুক্ষ ও কালো হয়ে যায়। প্রথমে এই অংশের ত্বক ভিজিয়ে রাখুন জলে। ত্বক যখন কুঁচকে

যাবে, তখন বুঝবেন যা যথেষ্ট আর্দ্রতা পেয়েছে। নারকেল তেল সাধারণত শীতকালে জমে যায়। জমা তেলের মোটা পরত লাগিয়ে নিন আর্দ্র ত্বকে। তার পর মোজা বা লম্বা হাতা টপ বা পাজামা পরে ঘুমোতে যান। টানা বেশ কয়েকদিন করলে নিজেই ফারাকটা বুঝতে পারবেন।

ওটমিল:

আজ বলে নয়, বহু হাজার বছর ধরে ত্বকের পরিচর্যায় ব্যবহৃত হচ্ছে ওটমিল। সবচেয়ে ভালো কাজে দেবে ইনস্ট্যান্ট ওট, সেটাকে ব্লেন্ডারে দিয়ে প্রথমে পাউডারের মতো গুঁড়ো করে নিন। তার পর গোসলের বাথটবে জল ভরে এক কাপ এই পাউডার দিয়ে ভালো করে ছড়িয়ে দিন হাত দিয়ে। দেখে নেবেন যেন নিচের দিকে দলা পাকিয়ে না থাকে। তার পর এই জলে ১৫-২০ মিনিট শুয়ে থাকুন। ওটমিল ত্বক পরিষ্কার করে, আর্দ্রতা জোগায়। এর মধ্যে উপস্থিত অ্যান্টিঅক্সিডান্ট বজায় রাখে উজ্জ্বলতা।

কমলালেবু:

কমলালেবুতে উপস্থিত ভিটামিন সি ঠেকিয়ে রাখে বলিরেখা। কমলালেবুর খোসা, সরবাটা, ময়দা বা বেসনের প্রলেপের ব্যবহার রূপটান হিসেবে বহুদিন প্রচলিত। এই শীতে যত কমলালেবু খাবেন, তার খোসা ফেলবেন না। সব রোদে শুকনো করে রেখে দিন। পরে গুঁড়ো করে ব্যবহার করতে পারবেন।

মেয়োনিজ:

শুনতে একটু অদ্ভুত লাগলেও মেয়োনিজ কিন্তু ত্বকের আর্দ্রতা ফিরিয়ে আনতে দারুণ কার্যকর। তবে মেয়োনিজে সাধারণত নুন, গোলমরিচ, মাস্টার্ড পাউডার ইত্যাদি যোগ করা হয় স্বাদ বাড়ানোর জন্য। এই জিনিসগুলি যোগ করার আগে খানিকটা তুলে রেখে দিন মাস্ক হিসেবে ব্যবহারের জন্য। তা না হলে ত্বকে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। ডিমের কুসুম আর তেল ব্লেন্ড করে যে মেয়োনিজ তৈরি হয়, তার সঙ্গে খানিকটা বেবি অয়েল মিশিয়ে নিন। তার পর মুখে, ঘাড়ে, কনুইয়ে, হাতে লাগিয়ে নিন গোসলের আগে। ডিমের গন্ধটা একটু কড়া, সেটা সহ্য করে নিতে পারলে এই প্যাকের কোনও জবাব নেই!

মধু ও পাকা কলা:

পাকা কলা ও মধু একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন। মুখে লাগান প্রলেপের মতো করে, তার পর ২০-২৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন ও ময়েশ্চরাইজার লাগান। এটি নিয়মিত ব্যবহারের ফলে ত্বক পাবে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা, তা হয়ে উঠবে নরম ও কোমল। পাকা কলা, মধু আর সরের প্রলেপও শুষ্ক ত্বকের খুব ভালো দাওয়াই হতে পারে। মধু অন্য নানা প্যাকের সঙ্গেও নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন।

আমন্ড তেল:

আমন্ড তেলে প্রচুর ভিটামিন ই থাকে এবং তা আপনার ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায় ও ত্বককে করে তোলে মসৃণ। ত্বক খুব সহজেই এই তেল শুষে নেয়, কিন্তু চটচটানি অনুভূত হয় না। অ্যালো ভেরা জেলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা আমন্ড তেল আর মধু

মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে নিন। মুখে লাগিয়ে ১৫-২০ মিনিট অপেক্ষা করে সামান্য গরম জলে ধুয়ে ফেলুন।

চকোলেটঃ

চকোলেটে উপস্থিত ক্যাফেইন থেকে ত্বকে আসে উজ্জ্বলতা। সেই সঙ্গে চকোলেটের ফ্যাটও ময়েশ্চরাইজার হিসেবে ভালোই কাজ করে। ডার্ক চকোলেট গলিয়ে নিন মাইক্রোওয়েভ ওভেনে। হালকা গরম থাকতে থাকতে তার সঙ্গে মধু মিশিয়ে ফেস প্যাক বানিয়ে নিন। মুখে, গলায়, ঘাড়ে, হাতে তা লাগিয়ে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করুন। চোখের নিচ আর ঠোঁটের আশপাশের অংশে যেন প্যাক না লাগে সেদিকে নজর রাখবেন। তার পর সার্কুলার মোশনে হাত ঘুরিয়ে ম্যাসাজ নিন মুখে, সামান্য গরম জলে ধুয়ে ময়েশ্চরাইজার লাগান।

শীতে যা করবেন নাঃ

অতিরিক্ত গরম জলে বেশিক্ষণ ধরে স্নান করবেন না, তাতে ত্বকের আর্দ্রতা ক্রমশ হারাতে থাকে।

গোসলের আগে অয়েল মাসাজ করলেও গোসলের পর অতি অবশ্যই ময়েশ্চরাইজার ব্যবহার করুন। তা না হলে শুষ্ক ত্বকের সমস্যা কোনওদিন কমবে না। ত্বক অল্প ভিজে থাকা অবস্থাতেই ময়েশ্চরাইজার লাগিয়ে নিন।

খুব কড়া সাবান আপনার ত্বকের শুষ্কতা কেড়ে নেবে। হালকা কোনও সাবান বা সোপ ফ্রি ক্লিনজার ব্যবহার করুন। বেসন, মুসুর ডাল বাটা, চালের গুঁড়ো ইত্যাদি দিয়ে ত্বক খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করা যায়। ক্লিনজার বা স্ক্র্যাবার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এই সতর্কতা মেনে চলা উচিত।

অ্যালকোহলযুক্ত টোনার বা যে কোনও স্কিনকেয়ার প্রডাক্ট এড়িয়ে চলুন। এগুলি ব্যবহারে ত্বকের আর্দ্রতার ভাঁড়ারে টান পড়ে। মিনারেল অয়েল, কৃত্রিম রং বা সুগন্ধিযুক্ত প্রডাক্ট ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

অহেতুক রোদ লাগাবেন না ত্বকে, বিশেষ করে সকাল ন'টার পর। সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। ছাতা, টুপি, সানগ্লাসও রোদের হাত থেকে আপনাকে বাঁচাবে। লিপ বাম কেনার সময়েও এমন কিছু বাছুন যার মধ্যে এসপিএফ আছে।

পরিবর্তন আনুন খাদ্যতালিকায়। ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন সি, আর ম্যাগনেশিয়াম যেন থাকে খাদ্যতালিকায়। তা না হলেই মুষড়ে পড়বে আপনার ত্বক। মাছ, আখরোট,

ফ্ল্যাক্সসিড বা তিসি, ফল, শাকসবজি রাখুন রোজের খাদ্যতালিকায়। খুব তেলমশলাদার বা ভাজাভুজিজাতীয় খাবার এড়িয়ে চলুন।

শীতের স্বাভাবিকতাকে উপভোগ করতে হলে নিয়মিত ত্বকের যত্ন করা যেমন জরুরী সেসাথে এই করোনা কালে যতটা সম্ভব ঘরে থেকে সুস্থ থাকার চেষ্টা করতে হবে সবার।

শীতে হাঁপানি রোগীদের করণীয়

শীতকালটা বরাবরই শ্বাসকষ্টে ভুগছেন বা হাঁপানী আছে এমন রোগীদের জন্য আরামপ্রদ কিছু নয় কারন শীতের সময় এ রোগের তীব্রতা অন্য সময়ের তুলনায় বেড়ে যায় । সেসাথে এবারে রয়েছে করোনার ঝুকিঁ। বাংলাদেশে প্রতি বছর ৫০ হাজার লোক এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং মাত্র পাঁচ শতাংশ রোগী চিকিৎসা লাভ করে। হাঁপানি রোগীদের জন্য শীতল আবহাওয়া, সর্দি-কাশি-ফ্লু বা ঠান্ডা-জ্বর প্রচন্ড কষ্ট বিপদের কারণ হতে পারে। প্রতি বছর শীতে শিশুদের ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ এবং বড়দের ৪০ শতাংশ হাঁপানি বা শ্বাসকষ্টের তীব্রতা বেড়ে যায়। এর প্রধান কারণগুলো হলো : এই সময়ে ঠান্ডা, জ্বর বা ফ্লু প্রকোপ, ঠান্ডা-শুষ্ক বাতাস যা শ্বাসতন্ত্র সংকুচিত করে, শীতে বেড়ে যাওয়া ধুলাবালু ও ধোঁয়ার পরিমাণ, কুয়াশা ও বদ্ধ গুমোট পরিবেশ ইত্যাদি। এসবই শ্বাসতন্ত্রের সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়, ফলে হাঁপানি রোগীর কষ্ট বাড়ে। তাই শীতে হাঁপানির রোগীদের প্রয়োজন বাড়তি সতর্কতা ও প্রস্তুতি।

হাঁপানি কি?

হাঁপানি একটি শ্বাসকষ্টজনিত রোগ। হাঁপানির অর্থ হলো হাঁ-করে শ্বাস নেয়া। হাঁপানি বলতে আমরা বুঝি শ্বাসনালিতে বায়ু চলাচলে বাধা সৃষ্টির জন্য হয় শ্বাসকষ্ট। সারা বিশ্বের প্রায় ১৫ কোটিরও বেশি মানুষ অ্যাজমা বা হাঁপানিতে আক্রান্ত হন। যাদের অ্যাজমা আছে তাদের সঙ্গে সাধারণত ইনহেলার থাকে। তবে কোনো কারণে হাতের কাছে ইনহেলার না থাকলে কী করণীয়? আসুন জেনে নেই হাঁপানি থেকে বাঁচাতে কী করবেন?

১. মাস্ক ব্যবহার অবশ্যই করতে হবে এক্ষেত্রে ভালো মানের মাস্ক ব্যবহার করবেন। সার্জিক্যাল মাস্ক ব্যবহার করা উত্তম হবে। ব্যবহার করেই নির্ধারিত স্থানে ফেলে দেবেন। কাপড়ের বা গেঞ্জীর কাপড়ের মাস্ক ব্যবহার হতে বিরত থাকবেন। ৪-৫ ঘন্টার বেশী কোন মাস্ক পরে থাকবেন না।

২. যাদের হাঁপানি, অ্যালার্জি আছে, তারা ঠান্ডা উপভোগ করতে যাবেন না। ঠান্ডায় বের হলে পরিষ্কার স্কার্ফ বা টুপি ব্যবহার করুন। বাইরে বের হওয়ার আগে আপনার নীল রঙের ইনহেলার দুই চাপ ব্যবহার করে নিতে পারেন। বেশি সময় বাইরে থাকতে হলে ইনহেলারটা সঙ্গেই রাখুন।

৩. শিশুরা অনেক সময় মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়। মুখ দিয়ে নেওয়া শ্বাস শুষ্ক এবং শ্বাসতন্ত্র আরো সংকুচিত করে তোলে। অন্যদিকে নাক দিয়ে নেওয়া শ্বাস উষ্ণ এবং আর্দ্র, ধোঁয়া-ধুলা ইত্যাদি ফিল্টার হয়ে আসে। তাই মুখে শ্বাস নেবেন না। শিশুদের বন্ধ নাক সব সময় স্যালাইন ড্রপ দিয়ে পরিষ্কার করে দিন।

৪. ধূমপান নিষেধ। এমনকি পাশের ব্যক্তির ধূমপানও আপনার সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। ঠান্ডা খাবার ও পানীয় এড়িয়ে চলুন।

৫. এমনকি রান্নার ধোঁয়াও শ্বাসকষ্ট বাড়িয়ে দিতে পারে। বাড়িতে কিচেনভেন্ট ব্যবহার করা ভালো। ঘর ধোঁয়ামুক্ত রাখার চেষ্টা করুন। মশার কয়েলও জ্বালাবেন না।

৬. ব্যায়ামের আগে ১০ মিনিট ওয়ার্ম-আপ করে নিন এবং প্রয়োজনে নীল রঙের ইনহেলার দুই চাপ নিয়ে শুরু করুন। অতিরিক্ত শীতে বাইরে না গিয়ে ঘরের ভেতর ব্যায়াম সেরে নিন।

৭. সর্দি হলে নাক মুছতে রুমাল নয়, পেপার টিস্যু ব্যবহার করুন। নাক, চোখমুখে ঘন ঘন হাত লাগাবেন না। সর্দি ঝাড়ার পর নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোবেন। সর্দি-কাশি-ফ্লু-আক্রান্তদের থেকে দূরে থাকা ভালো। করোনার এই সময়ে এটি মানতে হবে কঠিনভাবে।

৮. হাঁপানি রোগীরা শীতের শুরুতে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রতি বছর ফ্লু-ভ্যাকসিন নিতে পারেন।

৯. বাড়িতে কুকুর, বিড়াল বা পোষা পাখি শোয়ার ঘর থেকে দূরে রাখুন। ঘরের আসবাব শুষ্ক রাখুন, ধুলা জমতে দেবেন না।

আপনার ইনহেলার, ওষুধ, নেবুলাইজার ইত্যাদি রসদ পর্যাপ্ত ও কার্যকর আছে কি না খেয়াল করুন। পরিবারের সবাইকে এগুলোর স্থান ও ব্যবহার পদ্ধতি অবহিত করুন। বাড়িতে প্রাথমিক চিকিৎসার পরও শ্বাসকষ্ট তীব্র হলে অবশ্যই হাসপাতালে চলে যাবেন।

শ্বাসকষ্টের রোগীর জন্য ব্যায়াম

হাঁপানির রোগীদের ব্যায়াম করতে নিষেধ নেই। হালকা জগিং, হাঁটার মতো ব্যায়াম তাঁরা অবশ্যই করতে পারবেন। তবে তার সীমা জানতে হবে। যে পর্যায়ে ব্যায়ামের পর আপনি আর কুলোতে পারেন না, তার আগেই থামবেন। অনেক সময় হৃদরোগের কারণেও শ্বাসকষ্ট হয়। সে ক্ষেত্রে ব্যায়াম করার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই ভালো। মনে রাখবেন, হঠাৎ বেড়ে যাওয়া হাঁপানি বা সিভিয়ার অ্যাকিউট অ্যাজমার সময় ব্যায়াম করা যাবে না। যাঁদের হাঁপানি আছে, তাঁরা ব্যায়াম করতে যাওয়ার আগে দুই পাফ সালবিউটামল ও ইপরাট্রোমিয়াম-সমৃদ্ধ ইনহেলার টেনে নিলে সবচেয়ে ভালো হয়। এটা শ্বাসনালি প্রসারক হিসেবে কাজ করে। এতে পরবর্তী দুই থেকে চার ঘণ্টা শ্বাসকষ্ট থেকে মুক্ত থাকা যায়। এছাড়াও হাঁপানির মুক্তিতে নিচের যোগাসন ৪টি উপকারে আসতে পারে।

১) সুখাসন

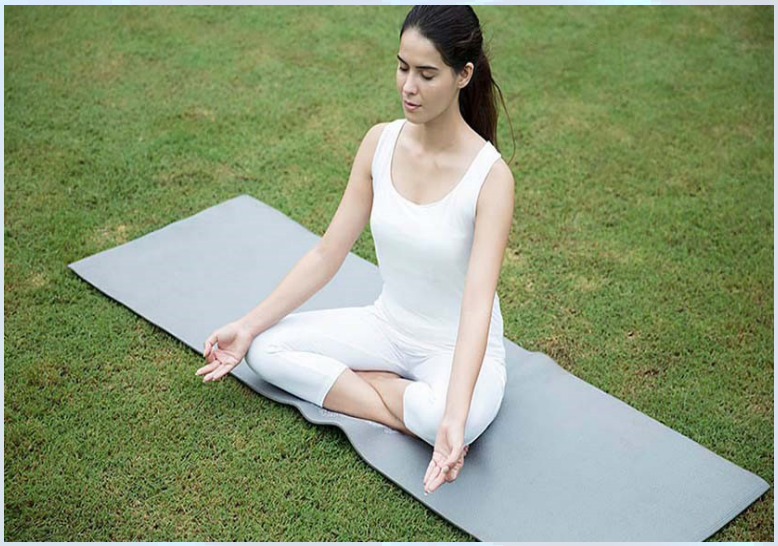

সুখাসন মনকে শিথিল করার পাশাপাশি আপনাকে শ্বাস নিয়ন্ত্রণে পুরোপুরি ফোকাস করতে সহায়তা করে। যা পরবর্তীতে আপনার ফুসফুসের জন্য খুব ভালো কাজ করে। যদি সঠিকভাবে অনুশীলন করা হয় তবে সুখাসন আপনাকে হাঁপানির বা শ্বাসকষ্ট মুক্তিতে যোগাসন এর মাধ্যমেই শ্বাসের

সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে। এটিকে সহজ বসার ভঙ্গি বা "ইজি সিটিং পোজ" হিসাবেও ধরা হয়ে থাকে। এবার তবে চলুন সুখাসন ব্যায়ামটি কিভাবে করতে হয় তাই জেনে নেই। প্রথমে সামনের দিকে পা প্রসারিত করে ইয়োগা ম্যাটের উপর বসুন। আপনার বাম পা ভাঁজ করুন এবং ডান উরুর ভিতরের দিকে টানুন। একইভাবে আপনার ডান পায়ের সাথেও প্রসেসটি রিপিট করুন। আপনি আরামদায়কভাবে বসে আছেন কিনা তা নিশ্চিত করুন। আপনার মেরুদন্ড সোজা রাখুন এবং স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিন। আপনি যতক্ষণ পারেন এই পোজটি ধরে রাখুন। প্রতিদিন কিছুক্ষণ এই সুখাসন ব্যায়াম আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য তথা হাঁপানি রোগের জন্য অনেক ভালো।

২) পবনমুক্তাসন

এই আসনটি বেশ সাধারন একটি আসন। অনেকেই জানেন যে পবনমুক্তাসন হজমজনিত সমস্যা দূর করার জন্য ভালো। তবে জানেন কি, পেটের অঙ্গগুলোর সাথে কাজ করে হাঁপানি

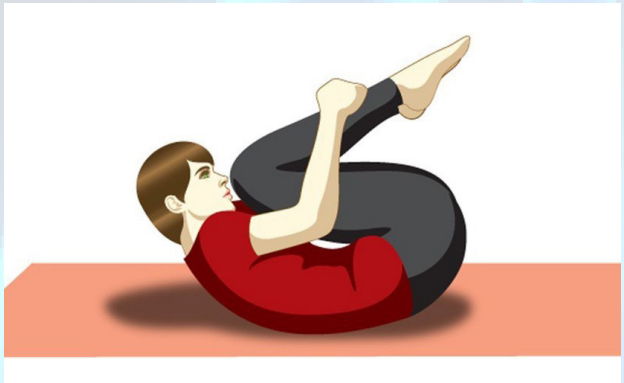

রক্ষা যোগাসন এর মধ্যে এটি অসাধারণভাবে কাজ করে? তাহলে চলুন জেনে নেই কিভাবে করবেন এই ব্যায়ামটি! সবার আগে ম্যাটের উপর পিঠ টানটান করে শুয়ে থাকুন। এরপর আপনার পা প্রসারিত করুন। আপনার ডান পা-টি তুলুন, আপনার ডান হাঁটুকে ভাঁজ করে আপনার ডান উরুটি আপনার বুকে কাছে আনুন। কিছুক্ষণ ধরে রাখুন। এবার আপনার বাম পা প্রসারিত করুন এবং আপনার বাম পা দিয়ে একইভাবে বুকের কাছে আনুন। এভাবে দুই হাঁটু ভাঁজ করা অবস্থায় আপনার বুকের কাছে ধরে রাখুন। কিছুক্ষণ ধরে রেখে আবার পা প্রসারিত করুন।

৩) প্রাণায়াম

আপনার যদি শ্বাসকষ্টের কোনও ধরনের সমস্যা হয় তবে ব্যায়াম একটি ভালো প্রয়াস। তবে প্রাণায়াম নিজে না বুঝে

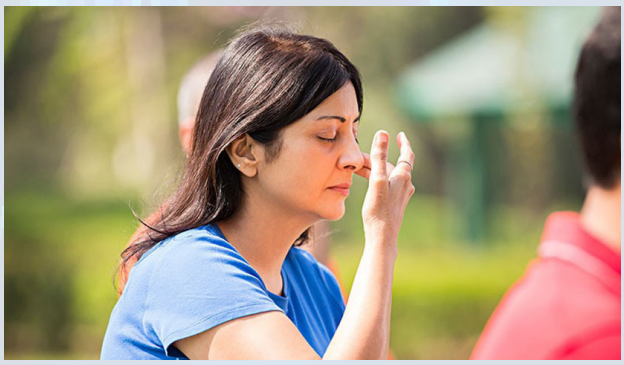

করতে যাবেন না! একজন উপযুক্ত প্রশিক্ষকের কাছ থেকে শিখুন। "নাদি শোধান" (বিকল্প নাকের শ্বাস-প্রশ্বাসের কৌশল) বা "কপাল ভাটি", যে কোনও ধরনের প্রাণায়াম আপনাকে আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসে মনোনিবেশ করতে সহায়তা করবে। এটি পরবর্তীতে হাঁপানি থেকে বাঁচতে অনেকাংশে নিশ্চয়তা দিতে পারে। এখন বেসিক প্রাণায়াম করার নিয়মগুলো বলছি। প্রথমে সুখাসনের মতো আরামদায়কভাবে বসুন। তারপর আপনার চোখ বন্ধ করুন এবং আপনার দুই হাতের তালু দুই হাঁটুতে রাখুন। এবার আপনার সম্পূর্ণ মনোযোগ দিন শ্বাস-প্রশ্বাসে। আপনার ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে নাকের ডানপাশ চাপ দিয়ে ধরে রাখুন। আপনার নাকের বাম পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস নিন। আপনার ফুসফুস বাতাসের সাথে ভরাট করুন। শ্বাস নেওয়ার পরে, আপনার নাকের বাম পাশে আপনার ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে ধরে রেখে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে নাকের ডান পাশ ছেড়ে দিন। আপনার নাকের ডান পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন। আবার আপনার নাকের বাম পাশের সাথেও একই প্রসেস রিপিট করুন।

৪) অর্ধমৎসেন্দ্রাসন

এই ব্যায়ামটিকে 'সিটিং হাফ স্পাইনাল টুইস্ট' ও বলা হয়ে থাকে এবং এটি হাথা ইয়োগার একটি অংশ। অর্ধমৎসেন্দ্রাসন আপনাকে কেবল মেরুদন্ডের স্নায়ু টানটান করতেই সহায়তা

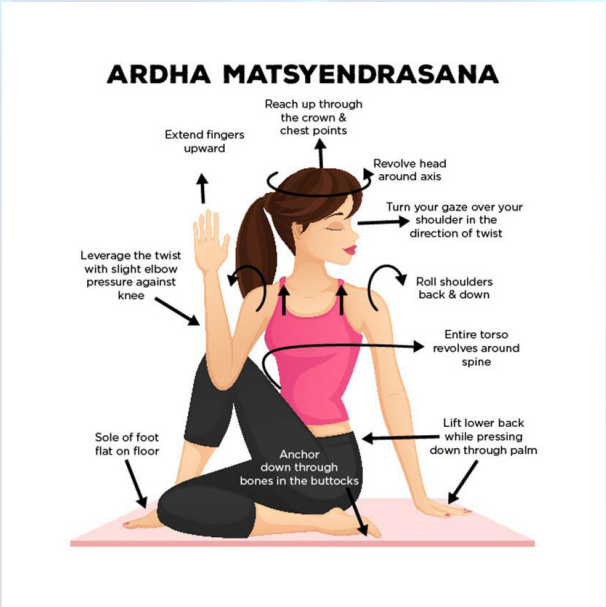

করে না, এটি আপনার ফুসফুসে অক্সিজেন সরবরাহও বাড়িয়ে তুলতে পারে। অন্য কথায়, এটি আপনাকে হাঁপানি কমাতে

সহায়তা করতে পারে। আসনটি করার জন্য প্রথমে মাদুরের উপরে বসে আপনার পা দুইটি প্রসারিত করুন এবং আপনার মেরুদন্ড সোজা রাখুন। আপনার বাম পা এমনভাবে বাঁকা করে আনুন যাতে করে আপনার বাম পায়ের গোড়ালিটি আপনার ডান মাজার পাশে থাকে। এখন আপনার ডান পা বাম হাঁটুর ওপরে নিন এবং এটি বাম হাঁটুর পাশে রাখুন। আপনার কোমরটি ডানদিকে মোড়ান এবং আপনার ডান কাঁধের উপর দিয়ে সোজা তাকান। আপনি আপনার পিছনে ডান হাত রাখতে পারেন এবং আপনি আপনার বাম হাতটি ডান হাঁটুর উপরে রাখতে পারেন। আপনার মেরুদন্ড সোজা রাখুন। কয়েক সেকেন্ড আসনটি ধরে রাখুন ও স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিন। কিছু সেকেন্ড পার করার পর স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে আসুন এবং আপনার ডান পা দিয়ে একইভাবে বিপরীত দিকে করুন।

এছাড়াও লেগ ক্রসিং অর্ধ কুর্মাসন মৎস্যোসন গুলো এ্যাজমা রোগে কার্যকরী ফলাফল দিতে পারে।

এখানে কয়েকটি সহজ আসন দেখানো হয়েছে। তবে আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এই আসনগুলো কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং উপযুক্ত ইয়োগা প্রশিক্ষকের সাথে সম্পূর্ণ পরামর্শের পরে অনুশীলন করা উচিত। আর নয়তো নিজে নিজে হাঁপানি নিরাময় করতে ইয়োগা করা ঠিক নয়।

যে খাবার হাঁপানির জন্য উপকারী

কলা: কলা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। কলাতে হাই ফাইভার আছে। তাই হাঁপানি রোগীদের ফুসফুস ভালো রাখতে প্রতিদিন একটি কলা খাওয়া খুবই ভালো। অনেক সময় চিকিৎসকরাও হাঁপানি রোগীদের নিয়মিত কলা খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কারণ প্রতিদিন একটি কলা খেলে ৩৪% পর্যন্ত হাঁপানি ভালো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পালং শাক: এটি স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। কারণ পালং শাকে ভিটামিন সি, ভিটামিন ই, বিটা ক্যারোটিন ও ম্যাগনেসিয়াম থাকে। তাই হাঁপানি রোগীদের জন্য পালং শাক খুবই উপকারী।

হলুদ: এটি জীবাণু ধ্বংসকারী হিসেবে খুবই বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই হাঁপানি রোগীদের খাবারে হলুদের পরিমাণ বেশি দিলে এ সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পাবে।

আপেল: আপেলও প্রচুর স্বাস্থ্যগুন সম্পন্ন একটি খাবার। হাঁপানির হাত থেকে ফুসফুসকে রক্ষা করার জন্য আপেলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই হাঁপানি রোগীদের প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় একটি করে আপেল রাখতে হবে।

আভোকাডো: এটিও হাঁপানির হাত থেকে ফুসফুসকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও হাঁপানি রোগীদের পুষ্টিকর, সুষম ও হালকা মসলাযুক্ত খাবার খেতে হবে। লাল বা হলুদ রঙের ফল, সবুজ শাক সবজি হাঁপানি রোগীদের জন্য খুবই ভালো। কারণ এসব খাবারে প্রচুর পরিমাণে বিটা ক্যারোটিন থাকে যা ফুসফুসকে শক্তিশালী রাখতে সাহায্য করে। ভিটামিন সি ও ভিটামিন ই সমৃদ্ধ খাবারসমূহ ফুসফুসকে ভালো রাখতে সাহায্য করে। সবুজ রঙের ফল ও শাক সবজিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি পাওয়া যায় আর মারজারিন, সয়াবিন ও অলিভ অয়েলে প্রচুর ভিটামিন ই পাওয়া যায়।

এসব খাবারগুলো হাঁপানি রোগীদের জন্য খুবই উপকারী। আবার অন্য কোনো রোগ থাকলে অনেক ধরণের খাবারে বিধি নিষেধও থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে খেতে হবে।

যেসব খাবার থেকে বিরত থাকতে হবে:

ডিম: স্বাস্থ্যকর ও প্রোটিন সমৃদ্ধ এই খাবারটি হাঁপানির সময় না খাওয়াই ভালো। ডিমের সাদা অংশে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে আর এই প্রোটিন অ্যালার্জির উদ্রেক করে হাঁপানি সমস্যার বৃদ্ধি করে থাকে।

দুধ: ক্যালসিয়ামের প্রধাণ উৎস হলো দুধ। দাঁত ও হাড় মজবুদ করার জন্য ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু দুধে থাকা প্রোটিন হাঁপানির সমস্যা বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। যখন হাঁপানির সমস্যা বেশি পরিমাণে দেখা দিবে, তখন দুধ খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

চিনা বাদাম: স্বাস্থ্যকর একটি খাবার হলো চিনা বাদাম। হাঁপানি রোগীদের জন্য এই চিনা বাদাম খুবই ক্ষতিকর। গবেষণা থেকে জানা যায় যে, চিনা বাদাম হাঁপানি সমস্যা বাড়িয়ে দিতে সহায়তা করে থাকে।

ফ্রোজেন আলুর চিপস: দোকানে ফ্রোজেন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কিনতে পাওয়া যায়। এই ফ্রোজেন আলুর চিপস খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ ফ্রিজে থাকার কারনে আলু ডিহাইড্রেটেড হয়ে যায়। যা হাঁপানি সমস্যা বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

সয়া: প্রোটিন সমৃদ্ধ আরেকটি খাবার হলো সয়া। সয়াতে অ্যালার্জিক প্রোটিন রয়েছে যা হাঁপানি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে থাকে। হাঁপানি রোগীদের অন্য সবার থেকে বেশি সচেতন থাকতে হবে। এসব রোগীদের ঠান্ডা ও ধুলোবালি এড়িয়ে চলাই ভালো। এমনকি আপনার পোষা প্রাণীগুলোর কারণেও হাঁপানির সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। তাই শ্বাসকষ্ট বাড়লে ঐসব প্রাণীর কাছেও যাওয়া ঠিক নয়।

টক জাতীয় ফলঃ লেবুবর্গীয় কিছু ফল আছে যেগুলোতে সিট্রাস (Citrus) বিদ্যমান। যেমন- কমলালেবু, মাল্টা, লেবু ইত্যাদি। এসব ফল ভিটামিন-সি'তে পরিপূর্ণ হলেও অ্যালার্জি ও অ্যাজমা অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায়। শুধু শীতকালে এ ধরনের ফল খাওয়া থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

ফাস্টফুডঃ ফাস্টফুড শুধু দেহের ওজনের জন্যই ক্ষতিকর নয়, ফুসফুসেও মারাত্মক প্রভাব ফেলে এ খাবার। ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, ফাস্টফুড জাতীয় খাবার গ্রহণে শিশুদের অ্যাজমা প্রবণতা ২৭ শতাংশ বাড়ে। গবেষকরা মনে করেন, ফাস্টফুডের উচ্চমাত্রার স্যাচুরেটেড ফ্যাট অস্থায়ীভাবে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে ফেলে। ফলে অ্যাজমা অ্যাটাকের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

চিংড়িঃ চিংড়িতে সালফাইটের পরিমাণ অনেক বেশি। অ্যাজমা রোগীদের সাধারণত চিংড়ি খেতে নিষেধ করেন ডাক্তাররা। শীতকালে ঠান্ডা চিংড়ি খেলে অ্যাজমা অ্যাটাকের সম্ভাবনা অনেক বেশি।

দরজায় কড়া নাড়ছে শীত। রোগবালাই থাকতেই পারে কিন্তু সর্তকতা ঝুঁকি কমায় তাই এই শীতে এ্যজমা বা শ্বাসকষ্ট নিয়ে সুস্থ থাকার জন্য সচেতনটা ভীষন জরুরী।

হাতে বানানো প্রাকৃতিক নারকেল তেল

আইভি খান ওয়াহিদ

এই তেলটা আমি নিজে বাসায় তৈরী করেছি। এর উপকারিতা অনেক, এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের অনেক কিছু দান করেছেন, তা যদি আমরা জেনে বুঝে মেনে চলি, তার উপকারিতার শেষ নেই। চলুন আমরা জেনে নেই , নারকেল তেলে, উপকার আমাদের মানব শরীরের জন্য কতটুকু কাজ করে এবং আমরা কিভাবে এই তেলের মাধ্যমে ভালো থাকতে পারি।

নারকেল এমন একটি ফল ,যা আল্লাহর থেকে প্রকৃতির সৃষ্টি ,এর গুণাগুন যে কত তার শেষ নেই। শুধু রান্নার

কাজেই এর ব্যবহার হয় না, এই নারকেল ঔষধ এবং সাবান তৈরীতেও আমাদের সাহায্য করে।

গ্যাস ও বদহজমের জন্য যারা অনেকদিন ধরে ভুগছেন , তারা রান্নায় Extra virgin নারকেল তেল বাসায় হাতের তৈরী রান্নার কাজে ব্যবহার করবেন। ইনশাআল্লাহ তা দূর হয়ে যাবে।

আমাদের অনেকেরই ত্বক শুষ্ক এবং রুক্ষ , তারা যদি Body oil হিসেবে ব্যবহার করেন তাহলে অনেক উপকার পাওয়া যাবে সাথে সাথেই।

আর যদি নিয়মিত body oil হিসাবে Massage করা যায়, তাহলে শরীর Dryness দূর হবে এবং কালো দাগ ও শরীরের ফাটল দূর হবে। শীতের সময় ও গরমের সময় ও যে কোন সময় এর কার্যকারিতার শেষ নেই। অনেক উপকার পাওয়া যায়। ঠোঁট ফেটে গেলেও রাতে দিয়ে ঘুমালে সেই ঠোঁট সুন্দর হয়ে যাবে।

এই নারকেল তেল মানবদেহে রক্তে যদি শর্করার পরিমান বেশী থাকে তাহলে নিয়মিত নারকেল তেল খেলে (হাতের তৈরী) তাহলে অনেক উপকার পাওয়া যাবে, একবার পরীক্ষা করেই দেখুন না। আমাদের বয়স যখন একটু উপরের দিকে যেতে থাকে অনেক কিছু অনেকেরই ভুলে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, অনেকের মাঝে আলঝেইমার্স এর প্রবনতা দেখা দেয়। প্রতিনিয়ত যদি নারকেল তেল খাওয়া যায় তাহলে অনেক উপকার পাওয়া যাবে। ইনশাআল্লাহ তা ভালো হয়ে যাবে।

বাসায় তৈরী করে আমরা যদি নারকেল তেল চুলে ব্যবহার করি তাহলে চুল হবে স্বাস্থ্যবান , চুল পড়া রোধ করবে, যার কোন বিকল্প পথ নেই। খুশকি দূর হবে । মাথা ঠান্ডা রাখবে। চুল লম্বা ও কালো হবে, একবার পরীক্ষা করেই দেখি আমরা ব্যবহার করে। বাইরের ভেজাল মিশানো তেল ভালো করার থেকে খারাপই বেশী করে, তাই ব্যবহার করব নিজের তৈরী করা নারকেল তেল।

আর যাদের হার্টের সমস্যা আছে,তাদের জন্য আল্লাহর দেয়া এই প্রাকৃতিক ফল এটা যে কতটুকু উপকার তার বলার কোন শেষ নেই, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু গবেষকগণ গবেষণা করে দেখেছে ৫০ এর বয়সের উর্ধ্বে কিছু মানুষের মাঝে এক নাগারে কিছুদিন নারকেল তেল খাওয়ানোর পর তাদের হার্টের অবস্থা কি, তাতে দেখা গেছে অনেক অনেক ভালো, এটা হলো ন্যাচারেল তেল ভালো ফ্যাট (good fat) যেটা হার্টের জন্য অনেক কার্যকর (cold pressed coconut oil) হাতের তৈরী হতে হবে।

প্রথমে হয়ত অনেকেরই সহ্য হবে না , আস্তে আস্তে সহ্য হবে খেতে খেতে। এই নারকেল তেল খুব সহজ ভাবে আমাদের শরীরে গ্রহণ করে। এই জন্য সবধরনের ক্ষতিকর তেল ছেড়ে দিয়ে আমরা নিজেরাই বাসায় তৈরী করে নিবো । আমাদের হার্ট ভালো রাখার জন্য ,আমরা সব রান্নাতেই যদি ব্যবহার করি তাহলে আমরা সবদিক থেকেই ভালো থাকতে পারবো।

আমার শরীরের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা গেছে ঠোঁটে ঠোসা পড়ে, ফুসকুরির মত হয় ; অন্য ঔষধে প্রায় ১

সপ্তাহ সময় লাগে, কিন্তু যদি আমরা নারকেল তেল ঠিক ঐ জায়গাতে সরাসরি ব্যবহার করি তাহলে ঠিক দুই দিনে ভালো হয়ে যাবে। এটা হলো আল্লাহর প্রাকৃতিক দান, তাই যখন আমাদের শরীরে ফ্লু হয় বা এফেক্ট বুঝতে পারবো, ঠিক তখনই এক টেবিল চামচ নারকেল তেল প্রতি তিন ঘন্টা অন্তর অন্তর যদি খাই তাহলে ফ্লু অবশ্যই ভালো হয়ে যাবে।(ইনশাআল্লাহ)

এই নারকেল তেল আমাদের শরীরে এতই কাজ করে যে, কোন ধরনের ইনফেকশন হোক না কেন, এই তেলই আমাদের শরীর এর ইনফেকশনকে সারিয়ে তুলবে অবশ্যই । অন্য দিকে আমাদের শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালি করে তুলে, শরীরের যেকোন জায়গাতে ফাংগাস বা চুলকানি হয়। যদি প্রতি নিয়তই আমরা বাসায় তৈরী করা এই নারকেল তৈল ব্যবহার করি তা অতি অল্পতেই সেরে যাবে। আমাদের শরীরের যত খারাপ ব্যাকটেরিয়া হোক না কেন, সব ব্যাকটেরিয়াকে মেরে দিবে। তাই আমরা এই cold pressed coconut oil ব্যবহার করব।

Antibacterial, Antiviral, Antifungus এবং Antiparasites হিসেবে যদি আমরা প্রাকৃতিক তেল (coconut oil) খাই তাহলে আমরা ভালো থাকব।

আর আমি বলবো যাদের কলোনের সমস্যা আছে তারা যদি প্রতিদিন যেকোন ভাবে এই প্রাকৃতিক তেল সেবন করি প্রতিদিন ৪ থেকে ৫ চামচ , তাহলে কোলন পরিষ্কার থাকবে।

শেষে আমার জ্ঞানের ছোট পরিসীমা থেকে বলবো, চলুন আজ থেকে আমরা অন্য তেল খাওয়া ছেড়ে দিই। Extra virgin olive oil, ঘানি ভাঙা সরষের তেল, cold pressed coconut তেল, হাতে বানানো প্রাকৃতিক তেল খাবো, তাহলে নিজেকে সুস্থ রাখতে পারবো। আর আমরা যারা কফি খেতে পছন্দ করি , এই কফির সাথে natural coconut oil ১ চামচ খেতে পারি সাথে natural butter দিয়ে তাহলে এর স্বাস্থ্যগত ভালো দিকটা আমরা পেতে পারি।

তারপর সবশেষে বলবো আমরা যে তেলই খেতে বা ব্যবহার করতে শুরু করি না কেন , প্রথমেই ছোট ১ চামচ দিয়ে শুরু করবো, পরে আস্তে আস্তে বাড়াবো তার পরিমাণ। প্রথমে হয়তো একটু কম সহ্য হবে তারপর

অক্টোবর মাস স্তন ক্যানসার সচেতনতার মাস। বিশ্বব্যাপী স্তন ক্যানসার নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য পিংক রিবন বা গোলাপি ফিতার মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হয়। স্তন ক্যানসার নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য আজকের এই বিশেষ আয়োজন

চাই সচেতনতা ও নতুন পদক্ষেপ

তাসমিয়া তাহমীদ
বিভাগীয় প্রধান ও ব্রেস্ট সার্জন, ব্রেস্ট কেয়ার সেন্টার, ডিফাম হাসপাতাল।

নারী হয়ে জন্ম নেওয়াই স্তন ক্যানসারের একটি ঝুঁকি। তাই প্রত্যেক নারীই স্তন ক্যানসারের ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করেন। বিশ্বে প্রতি ১৬ জন নারীর একজনের জীবনের যেকোনো সময় স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। উন্নত বিশ্বে তো বটেই, বাংলাদেশের নারীরাও এই ঝুঁকির বাইরে নন। তাই এখনই সময় সচেতন হওয়ার ও রোগ প্রতিরোধের। আর অন্য সব রোগের মতোই এখানেও সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হলো, দেরিতে রোগ শনাক্ত হওয়া এবং এ কারণে চিকিৎসা গ্রহণে পিছিয়ে পড়া। তাই বিশ্বজুড়ে গড়ে উঠেছে অত্যাধুনিক স্ক্রিনিং সিস্টেম। গড়ে উঠছে একই সেন্টারে একাধিক সেবা মেলে এমন মাল্টিডিসিপ্লিনারি ডায়াগনস্টিক টিম, যেখানে একাত্ম হবেন রেডিওলজিস্ট, প্যাথলজিস্ট, ব্রেস্ট অনকোলজিস্ট, ব্রেস্ট সার্জন, রেডিওথেরাপিস্ট—সবাই। গড়ে উঠেছে নারীদের জন্য ভয়ানক এই ঘাতককে রোখার ও এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, গাইডলাইন ও সরকারি আইনকানুন। আর যথারীতি এখানেও আমরা যথেষ্ট পরিমাণেই পিছিয়ে।

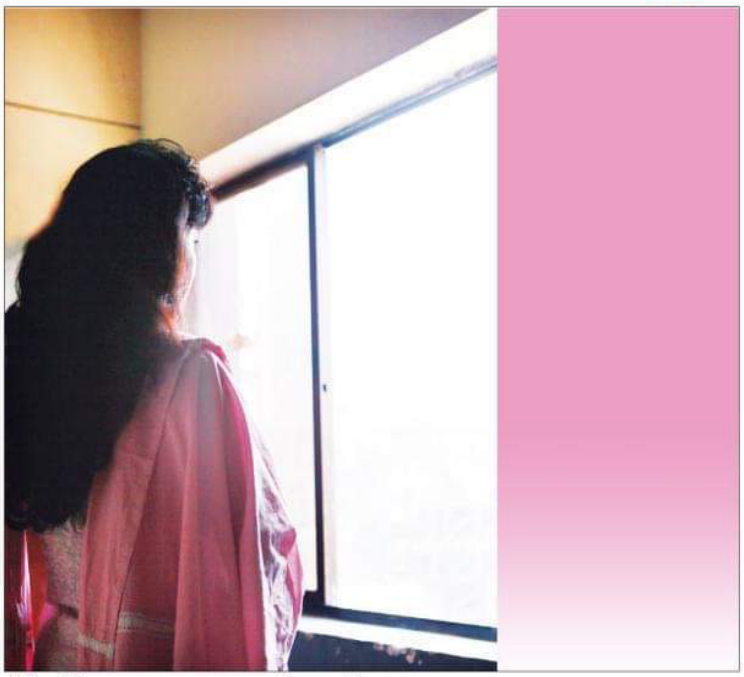

ছবিটি প্রতীকী। চাই সচেতনতা। চাই সুন্দর জীবন ● ছবি : স্বাস্থ্য কুশল

চাই দ্রুত ও সঠিক রোগনির্ণয়

দ্রুত ও সময়ানুগ রোগনির্ণয়ে সফলতাই স্তন ক্যানসার চিকিৎসার মূল চাবিকাঠি। এ জন্য সবার আগে চাই নারীর সচেতনতা। ৩৫ বছর পার হয়ে গেলেই নিজের স্তন সম্পর্কে সচেতন হতে হবে প্রত্যেক নারীকে। নিজেকে নিজে পরীক্ষা করা এবং স্তন ক্যানসারের লক্ষণগুলো সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকা হচ্ছে এই সচেতনতার প্রথম ধাপ। জেনে নেওয়া দরকার স্তন ক্যানসারের ঝুঁকিগুলো সম্পর্কেও। পরিবারে কারও স্তন ক্যানসারের ইতিহাস, অত্যধিক ওজন, মদ্দ খাদ্যাভ্যাস, হরমোন ট্যাবলেট সেবনের ইতিহাস, মাসিকের ইতিহাস—এগুলো জানা জরুরি। এর আগে স্তনে কোনো সমস্যা হয়েছিল কি না বা কোনো পরীক্ষা, যেমন—ম্যামোগ্রাফি করা হয়েছিল কি না। এগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়। এরপর দরকার একটি সার্বিক ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট। স্তনে যেকোনো সমস্যা বা সন্দেহজনক পরিবর্তনে প্রথমেই শরণাপন্ন হতে হবে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের। তিনি পূর্ণ ইতিহাস জানার পাশাপাশি আপনাকে বসিয়ে এবং শুইয়ে দুবার পরিপূর্ণভাবে দুটি স্তন ও দুটি বগল পরীক্ষা করবেন। যেকোনো সন্দেহজনক পরিবর্তন দেখলে তিনি শরণাপন্ন হবেন ল্যাবরেটরি পরীক্ষার।

এক. প্রথমেই আসে ব্রেস্ট ইমেজিং। প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে ম্যামোগ্রাফি ও আলট্রাসাউন্ড—এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ। ম্যামোগ্রাফি হচ্ছে স্তনের এক ধরনের বিশেষ এক্স-রে, যাতে সচরাচর ব্যবহৃত এক্স-রের তুলনায় কম তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করা হয়। আন্তর্জাতিকভাবে ম্যামোগ্রাফি স্তন ক্যানসারের জন্য একটি শক্তিশালী ও বহুল ব্যবহৃত স্ক্রিনিং পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। ৪০-পরবর্তী নারীদের নিয়মিত বার্ষিক ম্যামোগ্রাফির আওতায় আনা হয়েছে অনেক দেশে। তবে কম বয়সী নারী, যাঁদের স্তনগ্রন্থি অটোসাটো থাকে এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মা, যাঁদের তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহারে বিধিনিষেধ আছে, তাঁদের জন্য ম্যামোগ্রাফির বদলে আলট্রাসাউন্ড শ্রেয়তর। কেননা, এতে তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহার করা হয় না। তবে সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে ৩৫-উর্ধ্ব নারীদের জন্য একই সঙ্গে ম্যামোগ্রাফি ও আলট্রাসাউন্ড সবচেয়ে ভালো ধারণা দিতে সক্ষম। তবে লক্ষ রাখবেন, দুটি পরীক্ষাই যেন একই সময়ে বা কাছাকাছি সময়ে করা হয়, যা তুলনাযোগ্য হতে পারে। স্তনের জন্য হাই ফ্রিকোয়েন্সি লিনিয়ার প্রোব আলট্রাসাউন্ড রোগনির্ণয়ে বেশি কার্যকর।

দুই. বায়োপসি বিভিন্ন ধরনের হয়। চাকা বা পিণ্ড কত বড় ও কোথায় অবস্থিত, তার ওপর নির্ভর করে কোনটি ব্যবহার করা হবে। যেমন—কোর বায়োপসি হচ্ছে এমন একটি আধুনিক পদ্ধতি, যেখানে একটি সূক্ষ্ম সুচের (নিডল গান) মাধ্যমে চাকা বা পিণ্ড থেকে খানিকটা টিস্যু এনে দেখা হয় তার অস্বাভাবিকতা। সময় লাগে ১৫ মিনিট। এ সময় নির্ভুল জায়গায় পৌঁছাতে আলট্রাসাউন্ডের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। অপরদিকে কোনো চাকা চামড়ার বা স্তনবৃন্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আটকে থাকলে বা চামড়ায় কোনো ক্ষত বা ঘা থাকলে পাঞ্চ বায়োপসি করতে হয়। একজন দক্ষ প্যাথলজিস্ট এই বায়োপসি রিপোর্টটি করার সময় এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত মাত্রা বা স্কেল ব্যবহার করেন। রেডিওলজিস্টও একই সঙ্গে তাঁর ম্যামোগ্রাফি ও আলট্রাসাউন্ডের রিপোর্টের ক্ষেত্রে মাত্রা বা স্কেল ব্যবহার করবেন। আর যে চিকিৎসক রোগীকে দেখেছেন, তাঁর তো নিজস্ব ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট আছেই। এই ত্রয়ী বিশেষজ্ঞ অবশেষে সামগ্রিক বিবেচনায় সিদ্ধান্ত নেবেন রোগটি আসলে কী, তা কোন পর্যায়ে আছে এবং কোন ধরনের চিকিৎসা রোগীর প্রয়োজন। চিকিৎসকদের মতামতে গরমিল থাকলে প্রয়োজনে তাঁরা নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোনো পরীক্ষার পুনরাবৃত্তিও করতে পারেন বা আরও আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্য নিতে পারেন। বিশ্বে স্তন ক্যানসার নির্ণয়ের এই যুগপৎ প্রচেষ্টার নাম ট্রিপল অ্যাসেসমেন্ট বা ত্রয়ী পর্যবেক্ষণ নীতিমালা।

স্তনের সার্জারি : নতুন দিগন্ত

যদি ক্যানসার ধরা পড়ে, তবে তা স্তনের কতটুকু দখল করে আছে, অন্য স্তন বা আশেপাশের গ্রন্থিগুলোর অবস্থা কী, কতটুকু ক্ষতি হয়েছে এবং টিউমারের নিরাপদ সীমানা কতটুকু—এসব জটিল বিষয় বিবেচনায় এনে সার্জারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে। এত দিন স্তনের সার্জারি বলতে মাসটেকটমি (সম্পূর্ণ স্তন অপসারণ), র‍্যাডিকাল মাসটেকটমি (স্তনসহ গ্রন্থিগুলোর অপসারণ), ব্রেস্ট কনসার্ভি সার্জারি (স্তন সংরক্ষণ সার্জারি) প্রভৃতিকেই বোঝাত। কিন্তু এখন আধুনিক বিশ্বে চলে এসেছে অনকোপ্লাস্টিক টেকনিক, যার মাধ্যমে অকারণ বিকৃতি না করে, এমনকি তিন থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার আকারের টিউমারও নিরাপদে স্তন সংরক্ষণ করেই অপসারণ করা সম্ভব। এ ছাড়া সার্জারি ও রেডিওথেরাপির পর বিকৃতি রোধ করতে বলিউম রিপ্লেসমেন্ট সার্জারির সাহায্য নেওয়া হয়। তবে আধুনিক অনকোপ্লাস্টিক টেকনিক একই সঙ্গে ক্যানসার অপসারণ ও রিকনস্ট্রাকশন বা বিকৃতি রোধের সুযোগ এনে দিয়েছে।

চাই পদক্ষেপ

সংকোচ ও অবহেলা নারীকে নিজের স্তন বিষয়ে কুণ্ঠিত করে রাখে। নিজের সমস্যাগুলো গোপন করা, প্রকাশ করতে দেরি করা বা প্রকাশ করলেও তা পরিবার ও পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থায় আমলে না আসার চক্র নারীকে ঠেলে দেয় নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। যে রোগের চিকিৎসা আশাপ্রদ ও সহজলভ্য, সে রোগটি ভয়ংকর ঘাতকরূপে দেখা দেয়। তাই স্তন ক্যানসার ঠেকানোর প্রথম পদক্ষেপই হলো সচেতনতা। নারীরা নিজের সম্পর্কে নিজে সচেতন হোন, পরিবারের নারী সম্পর্কে অন্য সবাই সচেতন হোন, সর্বোপরি দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা নারীর সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন হোক—এটাই আমাদের আশা।

SPECIAL OFFER
For Global Presence

Basic

only
Tk. 2000/-
per year
Domain Registration and Hosting

call: 88 02-9355114

Bundle Offer

Domain, Hosting, Dynamic Website

Only
Tk. 22,000/-

Techsolutions
404, Golam Rasul Plaza
1st Floor, A-4
Dilu Road, New Eskaton,Dhaka
email: info@techsolutionsbd.com
www.techsolutionsbd.com

Standard

Domain Registration, Hosting, Website Design
only
Tk. 12,000/-
per year

call: 88 02-9355114

For details please call: +880 1926677536

Tradesworth
Household Ltd.
ROK®
একমাত্র
complete
ফ্লোর ক্লিনার
দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে
জীবাণু ধ্বংস আর পরিষ্কারের সাথে সাথে
এর সাশ্রয়ী কনসেনট্রেটেড ফর্মুলা
ফ্লোরকে রাখে ঝকঝকে...আজীবন
pH NEUTRAL
এসিডিক বা ক্ষারীয় নয়
৬টি
ভিন্ন সৌরভে
ROK
FLOOR CLEANER
Citrus Fragrance

Touching lives
every day, every moment
Transcom
Tradition in Excellence
Newspapers • Pharmaceuticals • Soft Drinks • Lighting • Consumer Electronics • Restaurants • Distribution • Tea Plantations
www.tel.com.bd